একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ

বিমল কর

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

EKTI SWAPNER GALI O KUMUD
A Collection Of Two Bengali Novelets
By Bimal Kar

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশিকা ঃ
অপর্ণা জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণগ্রন্থন ঃ
সুব্রতা ঘোষ
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক ঃ
ও'নিল অফসেট
১২বি, বেলেঘাটা রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৫

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত চৌধুরী

একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ

চেনার উপায় ছিল না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলার পর সন্দেহ হল। অতি অস্পষ্ট, প্রায় মুছে-আসা, এলোমেলো জটিল এক নকশার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে যেন চেনা-চেনা কোনও মুখের আদল ফুটে উঠছিল। জহর নাকি ? সেই গব্যঘৃত ?

"আচ্ছা, আপনি কি জহর?"

নিজের নাম শুনে লোকটার চোখের পাতা আর যেন পড়তে চায় না। ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকে। "হ্যাঁ, আপনি?"

"চুনি। চুনিলাল।"

জহর বিশ্বাসই করতে পারছিল না। গলার স্বর আটকে যাওয়ার মতন। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, "চুনি! চুনিলাল বিশ্বাস!"

"ইয়েস স্যার, অবিশ্বাসের কিছু নেই! কেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না বাবা! তুই এখানে কোথ্ থেকে ?"

"এখানে গোঁত্তা খেতে আসি। একটি হস্তিনীকে লালন করছি।"

জহর হেসে ফেলল। আটকে-যাওয়া গলা পরিষ্কার করে নিয়েছে বার কয়েক ঢোক গিলে। বলল, "তোর মুখের তো দেখছি কোনও উন্নতি হয়নি।"

"হয়নি। কেন? আমার মুখে দাড়ি দেখছিস না! মাথার চুল পাশে পাশে সাদা। চোখে চশমা।"

"তুই এই পাড়ায় থাকিস?"

"দূর শালা, এখানে থাকব কেন! বললাম তো, একটি হাতি পুষছি। এখানে এসে হাতির শুঁড়ে হাত বোলাই, লেজ নিয়ে...."

কথাটা পুরো শুনল না জহর। "কতটা খেয়েছিস? গন্ধ বেরুচ্ছে।"

চুনিলাল হাসল। "আমার সব মাপে হয়। নো মোর নো লেস। তা তুই বেটা গব্যঘৃত তুই এই বেয়াড়া জায়গায় কেন?"

"বললাম তো আগেই, সাতাশের এক বাড়ির খোঁজ করতে।"

"সাতাশ এক ! কে থাকে ?"

"জানি না। চিঠি নিয়ে এসেছি। এক মহিলাকে দিতে হবে!"

চুনিলাল সামনে পিছনে তাকাল। গলির সামনে, দু পাশে, সাত আটটা বাড়ি। দোতলা। দু-একটা আড়াই গোছের। বাড়িগুলো প্রায় একই ছাঁদের। নীচের তলায় সদর ঘেঁষে রোয়াক, দোতলায় সরু ঝুল বারান্দা, ঢালাই লোহার লতাপাতার ছাঁদ-করা রেলিং, রং মুছে গিয়েছে প্রায়, কোথাও রেলিংয়ের বদলে পাঁচিল, ওপরে লোহার জাল, কোনওটায় বা বারান্দা নেই, বড় বড় খড়খড়ি-করা জানলা, জানলার গায়ে শিকের গরাদ। বাড়িগুলোর তলায় যারা থাকে তারা বেশির ভাগই দোকানদার। ছোট ছোট দোকান ঃ মুদি, তেলেভাজা, পান-সিগারেট থেকে দরজি।

গলিতে আলো আছে, তবে জোরালো নয়। বাড়িগুলো পুরনো, স্যাঁতসেঁতে, বাইরের দেওয়ালে নানান তাপিতুপ্পি, রং বোঝা যায় না।

চুনিলাল গলির পিছন দিকে তাকাল। সরল এবং সোজা নয়, আঁকাবাঁকা, পেঁচিয়ে থাকা সাপ যেন। সামনে দিকে গলিটা যাও বা হাত কয়েক চওড়া, পিছনে ততই সরু হয়ে এসেছে। এই গলিরও বাই লেন, ব্লাইন্ড লেন আছে।

"কত বললি?"

"সাতাশের এক।"

"পেছন দিকে যেতে হবে। চল, কাউকে জিজ্ঞেস করি।"

গলিতে লোক আছে। মানে, যাচ্ছে আসছে। অবশ্য কম। রিকশাও ঢুকছে, বেরুচ্ছে। চুনিলাল জহরকে নিয়ে পিছনের দিকেই হাঁটতে লাগল।

"তুই এই পাড়ায় আসিস বললি, অথচ নম্বর জানিস না?" জহর বলল।

চুনিলাল বলল, "আমি কি নম্বর দেখতে আসি! আমাকে তুই পোস্টম্যান ভাবিস নাকি, বেটা। আমি আসি রমণীবিলাসে।"

জহর হাসল। "কেমন রমণী?"

"বললাম যে হস্তিনী।"

"মানে!"

"সাইজ আছে, ওজনে মার নেই, হাতির মতনই শান্ত ধীর, নির্বিকার। ....দাঁড়া ওকে জিজ্ঞেস করি —।" বলে চুনিলাল সামান্য সরে গিয়ে আধো-অন্ধকারে রাস্তা-ঘেঁষা রোয়াকে বসে থাকা এক জোড়া ছোকরাকে কী জিজ্ঞেস করল।

ফিরে এসে চুনিলাল বলল, "বাই লেনও নয়, ব্লাইন্ড লেন। খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে ব্লাইন্ড লেনে ঢুকতে হবে। তিনটে বাড়ির লাস্ট বাড়িটা।"

"এই গলিরও আবার ব্লাইন্ড লেন!"

"কেন ভাই গলির মানহানি করছ! খাস কলকাতা না হক, কলকাতার গা ছুঁয়ে রয়েছে। ভেরি ওল্ড প্লেস। এখানে এক কালে বাবুরা বাগানবাড়ি বানিয়েছিলেন, হপ্তা

কাটাতে আসতেন, জুড়ির ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেত, পেটি নামত হুইস্কি-রামের। সোডা, বরফের চাঙড়। এ বড় অভিজাত জায়গা ছিল ভাই। দু-পা পশ্চিমে গেলেই মা গঙ্গা। ঠাকুরও এই পথ দিয়ে কতবার এসেছেন গিয়েছেন।''

জহর বলল, ''গলিটা দেখ।''

''দেখছি। আরও অন্তত তিরিশ পা।''

''তুই এই পাড়ায় থাকিস না তো থাকিস কোথায়?''

''কেন! মেসে।''

''মেসে! কলকাতায় এখনও মেস আছে?''

''দু-চারটে পড়ে আছে। আমাদের মেসটা অন্য রকম। তিন জনে মিলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। দু-জন সার্ভিস-হ্যান্ড। একজন রান্না-বান্না করে, অন্যজন বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার। ....ভেবো না সস্তায় আছি! সার্ভিস পাই বলে দিতেও হয় ভাল। মাইনে, বছরে বোনাস, বাজারের চার্জ, অসুখ করবে ডাক্তার বদ্যি....!''

''তিন জনেই তোর মতন নাকি ?''

''আমার মতন! ওরে গব্যঘৃত, স্বর্গ একটাই থাকে, বাকি দুটো মর্ত্য আর পাতাল। তুই এখনও উজবুক থেকে গেলি। আমি হলাম স্বর্গ। ...ওই যে তোর গলি এসে গিয়েছে।''

গলি এসে গিয়েছিল। ইট-বাঁধানো গলি, চওড়ায় হাত তিনেক হবে হয়তো। আলো নেই। কোনওদিন ছিল কি না তাও বোঝা যায় না।

জহর কেমন আতঙ্ক বোধ করছিল। পাড়াটা তার ভাল লাগছিল না। তার ওপর অচেনা বাড়ি, চিঠিটা যাকে দিতে হবে সেও অচেনা। এবং মহিলা। চিঠির খামের ওপর মহিলার নাম লেখা আছে।

''চুনি, তুই একটু দাঁড়াবি!''

''দাঁড়াতে পারি।''

''না। মানে — মানে চিঠিটা যাঁকে দিতে হবে তিনি মহিলা।''

''মহিলা? ....কী নাম?''

জহর ততক্ষণে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে নিয়েছে। অবশ্য নাম দেখার দরকার তার নেই। নাম ঠিকানা মনে আছে তার। বলল, ''মানময়ী।''

''মানময়ী!'' চুনিলাল যেন কান পেতে শুনল নামটা। ভাবল। পরে বলল, ''নামটা শুনিনি এখানে। পুরনো নাম। সেই 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। ....যাক, তুই মানময়ীর মান ভেঙে আয়। আমি দাঁড়িয়ে আছি।''

জহর সাবধানে এগিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল চুনিলাল। জহর শালা ঘাবড়ে গিয়েছে। তা যেতেই পারে। এই গলিটা দেখলে খুশি হবার কারণ থাকে না। বদ্ধ, নোংরা, কলকাতার কোনও আজেবাজে পাড়ার গলির মতন বলেই মনে হয়। ওপরে তাকালে জানলায় বা রেলিংয়ে যে-ধরনের মুখ চোখে পড়ে তাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এখানকার চাপা বাতাসে রাস্তার বাড়ির ময়লা গন্ধের সঙ্গে নেশাভাঙের গন্ধও মেশানো।

চুনিলাল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। ধরিয়ে নিল। জহরকে অনুমান করতেও পারছিল। সাতাশের এক বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে।

গব্যঘৃতের সঙ্গে এতকাল পরে এইভাবে এ-রকম একটা পাড়ায় দেখা হতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। পুরনো বন্ধুরা সবাই কি হারিয়ে যায় ভিড়ে! না। বেশির ভাগই যায়; পাঁচ-সাত জনথেকে যায়। কেউ থাকে গায়ে-গায়ে, কেউ তফাতে। যেমন শ্রীকান্ত সলিল বেশ কাছাকাছি আছে চুনিলালের, দেখা হয় মাঝেমধ্যে, সলিল তো চুনিলালের অফিসের পাড়াতেই তার চেম্বার করেছে। ইনকাম ট্যাক্সের ল'ইয়ার সে। প্রফুল্ল, অনীশ, দেবব্রতর সঙ্গেও দেখা হয় চুনিলালের, দু-চারমাস অন্তর, আচমকা। ওরা একজন পুলিশে, একজন মিউজিয়ামে। দেবু কাস্টমস-এ। ...তা জহরের সঙ্গে দেখাটা সত্যিই চমকপ্রদ। কত বছর পরে দেখা? বিশ, না বাইশ, বাইশ না পঁচিশ! না, বছর কুড়ি বাইশ হবে।

জহর ফিরে আসছিল।

চুনিলাল মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া নিয়ে গিলে ফেলল।

কাছে এল জহর।

"পেলি?" চুনিলাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।

"পেলাম। প্রথমে একটা বাচ্চা ছেলে এসেছিল। বললাম, মহিলাকে ডেকে দিতে।"

"এল?"

"না। অন্য এক আধবুড়ি এল। বলল — মা নামতে পারবে না। ভীষণ হাঁফের কষ্ট। চিঠিটা ওই বুড়িকে দিলাম।"

"মানময়ীর বাড়িতে থাকে? কাজের লোক?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"চিঠি বিলি করে নিজের পরিচয় দিয়েছিস?"

"দু কথায়। চল, আর নয়। .....আবার একবার বোধহয় আসতে হবে।"

"চল।"

গলি পেরিয়ে ছোট রাস্তা। সামান্য এগিয়ে ডালভাঙা এক তেঁতুলগাছ। গাছ ছাড়িয়ে এলে বড় রাস্তা। আলো স্পষ্ট। বাস যাচ্ছে। ট্যাক্সি। প্রাইভেট গাড়ি।

চুনিলাল বলল, "তোর যাত্রা কোথায়? মানে, কোন দিকে যাবি?

"কেন! কলকাতা?"

"কলকাতা! তাহলে চল একটা ট্যাক্সি ধরি, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।" বলতে বলতে চুনিলাল রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস গেল একটা, তার পরই দুটো প্রাইভেট। একটা প্রাইভেট হরদম আলো মারছে, নিভিয়ে দিচ্ছে, সামনের গাড়িটাকে টপকাতে চায়।

"কলকাতায় কোথায় যাবি?" চুনিলাল বলল।

"আমার হোটেলে; শিয়ালদা হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি।"

"হোটেলে উঠেছিস! .....তুই থাকিস কোথায়?"

"সিঁদরির কাছে।"

"ফার্টিলাইজারে চাকরি করছিস?"

"করতাম। ছেড়ে দিয়েছি। এখন একটা ব্যবসা করছি....ছোট ব্যবসা। আগে সিঁদরিতেই থাকতাম, সেখানেও থাকি না। একটু বাইরে থাকি।"

চুনিলাল ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে জহর বলল, "তোর মেসটা কোথায়?"

"মানিকতলায়। বিডন স্ট্রিটের কাছেই। ....সিগারেট খাবি?"

"না। ছেড়ে দিয়েছি অনেককাল। কখনও সখনও এক আধটা--।"

"কী খাস তবে? আতপ চাল আর কাঁচকলা—"

জহর হাসল।

চুনিলাল বলল, "....তুই তো একেবারে মায়াপুর হয়ে গিয়েছিস, শালা! বিয়ে করেছিস নিশ্চয়। বাচ্চাকাচ্চা..."

জহর মাথা নাড়ল। "না। বিয়ে করিনি। আমার ফ্যামিলি বলতে মা আর বিধবা বোন।"

চুনিলাল একটু চুপচাপ থেকে জহরের থুতনিতে ডান হাতের আঙুল ছুঁইয়ে নেড়ে দিল। তারপর আঙুলগুলো নিজের ঠোঁটের ডগা ছুঁয়ে 'চুক' করে শব্দ করল। "বেঁচে থাক বেটা; তোর কেস আমারই মতন। তবে আমার নো বিধবা বোন। মা আছে। যদিও মাতৃসেবা করতে হয় না। উনি কাশীতে এক মাতাজির আশ্রয়ে—মেয়েদের আশ্রমে থাকেন; ভেরি ডিটারমিণ্ড মহিলা, নিজের স্বামীর তোয়াক্কাই করেন নি, তো আমার। কেয়ারই করেন না। কিঞ্চিৎ অর্থবানের বউ ছিলেন মহিলা, মানে বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি — দুই বাড়িরই ছিল গচ্ছিত কিছু। ফলে ইয়েটিয়ে আছে। আমি ঠিক জানি না, কী রকম আছে। কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার।"

জহর শুনছিল কথাগুলো। চুনিটা সেই রকমই আছে, খোলা মেজাজে, ভাবনাচিন্তার বালাই নেই, মুখে আটকায় না কিছু। কে বলবে, ও সাবালক। একেবারে ছেলে-ছোকরার মতন ফুরফুরে ভাবসাব।

চুনিলাল নিজেই বলল, "তো শালা তুই বিয়ে-থা করলি না কেন! বিয়ে করলে ভ্যারাইটি পেতিস। বাচ্চাকাচ্চা হত, ভেজা কাঁথা শুকোত দড়িতে, প্যান্টি ইজের, ফিডিং বোতল, বাচ্চাকাচ্চার টকটক বমি...."

জহর হাসতে লাগল।

"হাসছিস কেন। এখন আমাদের বয়স কত হল খেয়াল রাখিস?"

"চল্লিশের ওপর।"

"তবে শালা! চল্লিশ ছাড়ালেই তোর হয়ে গেল। লেগ বিফোর বার্নিংঘাট। আর তোকে বিয়ে করবে কোন মেয়ে? বলবি, তোর চেহারাটা এখনও খানিকটা ধরে রেখেছিস। ওতে কিছু হয় না রে! বিয়ের মেয়েরা আজকাল কম্পিউটারে সব দেখে নেয়। ভূত-ভবিষ্যৎ।

জহর জোরে হেসে উঠল। এত জোরে যে ট্যাক্সির ড্রাইভারও যেন একবার ঘাড় ঘোরালো সামান্য। এই রাস্তাটা ভাল নয়। মাঝেমাঝে লাফিয়ে উঠছে। দু'পাশের ঘরবাড়ি বেছাঁদ। ফাঁকা মাঠ জমি ঝোপঝাড় চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও একটা শেড, কোথাও বস্তি, কোথাও বা গ্যারাজ। গাছপালার ডালে-পাতায় কার্তিক মাসের কুয়াশা জমছে। দূর থেকে ভোঁ বেজে উঠল যেন। কিসের ভোঁ কে জানে। একটা লরি রাস্তার এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। চাকা খুলে গিয়েছে বোধ হয়।

পকেট থেকে রুমাল বার করে জহর ঠোঁট মুছল। হাসির তোড়ে সামান্য লালা বেরিয়ে এসে ঠোঁট ভিজিয়ে দিয়েছিল। বলল, "তা তুইও তো একটা বিয়ে করলে পারতিস। কাঁথা অয়েলক্লথের গন্ধ শুঁকতে পেতিস।"

"আমি—!" চুনিলাল বলল, "আমাদের বংশে বাবারই লাস্ট বিয়ে, তারপর বিয়ে নেই। জ্যোতিষবচন। বংশরক্ষা হবে না। তবু একবার চেষ্টা করেছিলাম, ভাই। তোকে মিথ্যে বলব না। মেয়েটা ভালই। ফণাও ছিল না, ডানা মেলাও ছিল না। একেবারে কলাগাছও নয়। সেই মেয়ে হুট করে কী যে বাজে রোগ বাধিয়ে বসল। ডাক্তাররা প্রথমে বলল, হরমোন ট্রাবল; তারপর বলল, ব্রেইন সেল ড্যামেজ, লো ফাংশান....। লম্বাচওড়া এক নাম বলল মুখে। তারপর মেয়েকে নিয়ে তার বাবা সাউথে চলে গেল। ট্রিটমেন্ট করাবে। আর ফিরল না।

জহর যেন চমক খেল। দুঃখও বোধ করল। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বলল, "কী হ'ল সেই মেয়ের?"

"আর ফেরেনি। ....খোঁজ নিয়েছিলাম; শুনলাম, কেয়ার কলোনিতে থাকার সময়

একটা ছোট অ্যাকসিডেন্টে সেখানেই মারা গিয়েছে।''

জহর সখেদ শব্দ করল।

চুনিলাল অবশ্য প্রসঙ্গটা টানল না। জিইয়ে রাখার চেষ্টাও নয়। অতীত যেন অতীত। কথা পালটে নিয়ে বলল, ''তোর ওই — কী নাম বললি যেন— মান—মানময়ী; ওই মহিলা কে ?''

''জানি না।''

''না জেনে চিঠি দিতে এসেছিলি?''

''একজন বলল। আমাদের ওখানকার —!''

''ও! তুই যে-পাড়ায় গিয়েছিলি সেটা সুবিধের নয়, তা জানিস?''

''না। সুবিধের নয় মানে?''

''মানে পুরোপুরি গেরস্থ পাড়া নয়। এক সময়ে এখানে জোড়া বাগানবাড়ি ছিল। দুই ভাইয়ের। মাসতুতো পিসতুতো হবে। বিস্তর জমিজায়গাও ছিল। সেই সাবেকি বাবু-কলকাতার ব্যাপার। বাগান থেকে বসতি, ঘরদোর, পাড়া। পারুল লবঙ্গ কালো বেদানা ডালিমদের বাড়ি। তাদের পয়সায় নয়, অন্যের টাকায়। শেষে এখানে পাঁচমেশালি লোকজনের বাস শুরু হল। বস্তি ছড়িয়ে গেল। ....যাক গে, ইতিহাসচর্চা করে লাভ নেই। মোদ্দা কথা পাড়াটা এখনও ভদ্রসমাজে পুরোপুরি নাম লেখাতে পারেনি। পুরনো রং উঠে গিয়েছে অনেকটাই, একেবারে সাফ হয়ে যায়নি।''

জহর বুঝতে পারল। বলল, ''তুই এখানে আসিস কেন?''

''বললাম যে, হস্তিনী লালন করি।''

''হেঁয়ালি ছাড়।''

''হেঁয়ালি ছাড়লে বলতে হবে—এখানে আমি একটি রমণীর কাছে আসি। তিনি স্থূলকায়া। নাম কুমুদ; কুমুদিনী থেকে কুমুদ। আমি বলি, তোমার নামটি যে চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না ভাই, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কুমুদ বলে, হলে কী করব, আমি তো এমন ছিলাম না, গা-গতরে মোটা হয়ে উঠলাম—সে কি আমার দোষ, না ধাতে ধরে গেল—কেমন করে বলব!''

ট্যাক্সিটা বড় বড় গুদোম গোছের দুটো বাড়ি পেরিয়ে একটা ছোট সাঁকোয় উঠে গেল। নদীর বাতাস আসছে।

চুনিলাল বলল, ''কলকাতায় ক'দিন আছিস?''

''দিন তিনেক থাকতেই হবে। দরকার পড়লে আরও দু-এক দিন।''

''উত্তম কথা। তা হলে কালই হোটেল ছেড়ে চলে আয়।''

''কোথায়?''

''আমাদের মেসে, চুনিস প্যারাডাইসে—!''

"তা কেমন করে হবে! তোর মেসে অন্য দু'জন মেম্বার আছে।"

"গোলি মারো শালাদের। তুই আমার গেস্ট —!"

"ওদের...."

"আবার ওদের। ওদের বাপের কী! জানিস, বাড়ি আমার নামে, চুনিলাল বিশ্বাসের নামে। আমার বাড়ি, আমি ওদের থাকতে দিয়েছি, ইট ইজ মাই মারসি। তপন আমার মুখের ওপর কথা বলবে! অত সাহস ওর। আর রতিবাবু তো মাসের মধ্যে বারো-চোদ্দ দিন অফিস টুরের নাম করে কোম্পানির পয়সা মারে। এসব তোকে ভাবতে হবে না। গেস্ট ওদেরও আসে। তুই আমার গেস্ট।"

জহর ইতস্তত করল। "তোদের অসুবিধে হবে।"

"কিস্যু হবে না। ....তুই আমার সঙ্গে থাকবি। জমিয়ে দেব শালা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে তোর দেখা করিয়ে দেব। সব ক'টাকে পাব না। তিন-চারটে আমার হাতের কাছেই থাকে। ....হ্যাঁ রে, জহর — তোর প্রাণের ইয়ার শচীনের সঙ্গে দেখা করবি না? সে বেটা এখন হাই বস। এম জি কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার। ফার্ন রোডে থাকত। রিসেন্টলি ঢাকুরিয়ায় ফ্ল্যাট কিনেছে। মেয়ে আমেরিকায়। জাস্ট গিয়েছে। ভাল ছেলে পেয়ে মেয়ের সঙ্গে গিঁট বেঁধে দিয়েছে! মেয়েটাও ভাল ছিল। বাপ ছিল ডাবের খোল। কপালে ছিল — মই বেয়ে উঠে পড়েছে। মারুতি চেপে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেমেয়ে উল্টো। মাঝে মাঝে ভাবি, এটা হল কেমন করে! আজকাল সব ব্যাপারেই জিন। আমার মাথায় ঢোকে না।"

ট্যাক্সি কলকাতায় ঢুকে পড়ল। চিৎপুর ব্রিজ ছাড়িয়ে এসেছে।

জহর বলল, "আমায় কি চিনতে পারবে!"

"না পারলে বেটাকে জুতোবো। চুনির সঙ্গে খেলতে এলে মরবে।"

"দেখি— যদি সময় পাই।"

"পাবি। কাল থেকে তুই আমার কেয়ারে। শুধু তোর নিজের কাজে আমি নাক গলাব না। বাকিটা আমার রুটিনে চলতে হবে।"

জহর হাসল। "তুই সত্যিই ছাড়বি না।"

"ন্যাকামি করিস না! যা বলছি, তাই করবি। চল যাবার পথে তোকে আমার ডেরাটা দেখিয়ে নিয়ে যাই।

দুই

চুনিলাল বলেছিল, মেস। জহর এসে দেখল, মেসবাড়ি বলতে যা বোঝায় চুনির মেসের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। জহর মেস দেখেছে, নিজেও একসময় দু-চার মাস ছিল মেসে, লাহাবাবুর গলিতে, হরিশ লাহার গলি, কলকাতা শহর থেকে মেস তখন উঠে যাচ্ছে একে একে, অবশিষ্ট যা পড়ে আছে তার আর সেই সাবেকি চেহারা চরিত্র কোনওটাই নেই।

চুনির মেস বলতে একটা বাড়ির দোতলা আর তেতলার অর্ধেক। বাড়ির নিচের তলাটা অন্য লোকের ভাড়া নেওয়া। ওটা একরকম ছোটখাটো গুদোম; পেস্টবোর্ডের বড় বড় পেটি পড়ে আছে — ওয়াশিং পাউডার, কেক, লিকুইড সোপ, বডি সোপ থেকে আরও নানান দ্রব্যের। এক এজেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউটারের গুদোম। দরোয়ান থাকে একজন। নীচের সঙ্গে ওপরের কোনও সম্পর্ক নেই। একমাত্র সিঁড়ি ছাড়া। দোতলায় দুটি ঘর, মাঝারি মাপের। একটা বাথরুম, খোলা জায়গাও আছে সামান্য, করিডোর মতন, বাড়তি এক জলকলও আছে ওখানে। তেতলার আধখানা জুড়ে একটা বড় ঘর। চুনির। বাকি জায়গাটা খোলা ছাদ। একপাশে ছোট রান্নাঘর, অন্য পাশে জলের ট্যাঙ্ক ঘরের লাগোয়া একফালি প্যাসেজ-মতন জায়গায় বাথরুম।

চুনিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা সামলায় দশরথ। মাঝারি বয়েস। থলথলে চেহারা। পরনে হয় পাজামা, না হয় লুঙ্গি। গায়ে বাবুদের দেওয়া হাফহাতা বুশ শার্ট। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত। বাবরি ধরনের। পান খায় অনবরত।

চুনির ঘরে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, আবার যা যা দরকার হয় সাধারণত সবই আছে। আছে একরাশ বই; এলোমেলো করে ছড়ানো, কিছু কাগজপত্র।

দোতলায় থাকে তপন আর রতিবাবু।

এই বাড়িটা পাবার ইতিহাসও শোনা হয়ে গিয়েছে জহরের। বাড়ি নন্দীদের। কাশীনাথ নন্দী পরিবারের। বড়লোক মানুষ ছিলেন। সোনাদানা গহনার কারবার। যাকে বলে জুয়েলার্স। কাশীনাথের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল চুনিলালের। ছেলেই বাড়িটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

জহর প্রথমটায় দোনামোনা করেছিল, অস্বস্তিও বোধ করছিল। চুনিলালের হাতে পড়লে তার কী দশা হবে ভেবে উৎকণ্ঠাও হচ্ছিল। কিন্তু চুনি ছাড়বে না। জহরকে আসতেই হল।

এসে দেখল, তার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। পুরনো বন্ধু পেয়ে চুনি একেবারে মেতে উঠেছে।

"কী রে শালা, কেমন লাগছে?"

"ভাল।"

"শুধু ভাল কী রে! বল ফার্স্ট ক্লাস....! তোর অসুবিধে হচ্ছে কোনও। শিয়ালদার ওই হোটেলের খুপরির চেয়ে এ অনেক বেটার। দাশু রান্নাটাও খারাপ করে না। তবে পোলাও কালিয়া খেতে চাইলে—!"

চুনিলালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জহর হেসে বলল, "পোলাও কালিয়ায় আমার লোভ নেই। লিভারের রোগী...."

"মাল খাস না বলে," চুনিলাল সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, "অ্যালকোহল খা, দেখবি লিভার তাজা হয়ে গিয়েছে। অ্যালকোহল ইজ দ্য বেস্ট রিমেডি। ওর মধ্যে কোনও জার্ম বাঁচে না, তোর লিভারের পোকা মালেই মরে যাবে।"

জহর হাসছিল। "ঘরটাকে যা করে রেখেছিস তাতে মনে হচ্ছে তোর লিভারের পোকা মাথায় উঠেছে।"

"কেন?"

জহর মুখে কিছু বলল না, চোখ দিয়ে ঘরের অবস্থাটা দেখালে। বাসনকোসন মাজার ঝি এসে বাসন মাজে, ঘরদোর ঝাট দিয়ে মোছামুছিও করে দেয়—কিন্তু অন্য কোথাও হাত দেয় না। হাত লাগানো বারণ। খাট বিছানা চাদর যদি বা সামান্য পরিষ্কার, অন্য কোনও আসবাব নয়। সোফা-কাম-বেড আছে একটা, তার আচ্ছাদনের ওপর ধুলো জমেছিল পুরু হয়ে, একরাশ বই এলোমেলোভাবে ছড়ানো তার ওপরে, মায় ময়লা চেহারার পাজামা একটা, গা-মোছা তোয়ালে। জহর আসার পর সেগুলো সরানো হয়েছে। ওটা এখন জহরের শোওয়ার জায়গা। পাতলা তোশক আর চাদর পেতে বালিশ মাথায় একটা রাত ভালই কেটেছে তার। কিন্তু ঘরের একপাশে রাখা বড় মার্বেলটপ গোল টেবিল আর একটা টুলের ওপর বই-কাগজগুলো রাখায় সেগুলো পড় পড় অবস্থায় হেলে আছে। ঘরের এক পাশে কয়েকটা খালি মদের বোতল। তার মধ্যে তিনটে বোতল দেখতে চমৎকার। একটার মধ্যে কাগজের ফুল, অন্য একটায় আবার ফাইবারের শিস সাজানো। গোল টেবিলের মাঝমধ্যিখানে একটা চায়ের বাহারি পট। সিরামিক্সের। তার মাথার ঢাকনিটা নেই। পটটা একেবারে বিদেশি মার্কা। পাতার সূক্ষ্ম নকশা আঁকা, অতিরিক্ত কোনও দাগ নেই, সাদা ধবধবে রং পটটার। ঘরের যত্রতত্র কয়েকটা কৌটো, সিগারেটের পুরনো প্যাকেট, একটা ফেলে-দেওয়া গড়গড়া। দেওয়ালে একটিমাত্র ছবি। পেইন্টিংই বলতে হয়। অদ্ভুত ব্যাপার. ছবিটায় যদি ঘোড়া এমন কি কুকুর দেখা যেত — তাতেও অবাক হত না জহর। কিন্তু যে-প্রাণীটি সেখানে আছে সেটি একটি গাধা। চুনি বলেছে, ছবিটা সে নিজেই বিলাসকান্তি বলে এক আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছে। গিয়েছিল চন্দননগরের বন্ধুর বাড়ি আড্ডা মারতে। সেখানে জোর করেই আঁকিয়ে নিয়েছে। বন্ধু লোক, এঁকে

দিয়েছে জোর জবরদস্তির ফলে। প্যাস্টেল দিয়েই। এঁকে দিয়ে বলেছে, এর চেয়ে তুমি আমাকে হাঁস মুরগি আঁকতে বললে খুশি হতাম।

বুঝলি গব্যঘৃত, বিলাস হল একেবারে ওল্ড স্টাইল আর্টিস্ট। শালা আবার ধম্মটম্ম করে। ওর হাত ভাল; স্পেশ্যালি রং-টাকে ছড়ায় দারুণ। শ্রীচৈতন্য, কালী, অহল্যা উদ্ধার— এই সব আঁকে। কোথাও যায়-টায় না। খ্যাতির লোভ নেই। কাগজওয়ালাদের তেল দেয় না। থাকে চন্দননগরে। মা গঙ্গার কাছেই। ....তা আমি বললাম, গাধায় তোর কি আসে যায়! আরে বাবা, গাধাও তো মা শেতলার বাহন। তারও প্রেস্টিজ আছে। তা ছাড়া অষ্টাদশ পুরাণ আর আঠাশটা উপপুরাণের মধ্যে চারটেতে গাধাকে শাপভ্রষ্ট স্বর্গীয় অশ্ব বলেছে। ...এটা অবশ্য পিওর গুল। বিলাসকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। ....বেটা ....খুব চটে গিয়ে এঁকে দিয়েছে। তবু নজর করে দেখলেই বুঝতে পারবি। ওটা আমাদের ধোপার গাধা না হয়ে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। মুখটা প্রায় আমাদের মতন।

জহর ছবির গল্পটা শুনেছিল কালই। হোটেল ছেড়ে গতকাল বিকেলে চুনির মেসে আসার পর। সন্ধের পর আড্ডার মধ্যে। একটা রাত তার কেটে গেল।

এখন সকালের দিকে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল দুজনে। নীচের তলায় রতিবাবু দশরথকে নিয়ে বাজারে গিয়েছেন। বাজারের শখ আছে ভদ্রলোকের। চুনির অতিথি এসেছে বলে উনি যেন একটু বেশি উৎসাহী। তপন তার নিজের ঘরে।

চুনিলাল বলল, "তুই আমার ঘরের কথা বলছিস?"

"মাঝে মাঝে নিজেই একবার ঝাড়াঝুড়ি করলে পারিস।"

"পাগল! আমার এটাই স্টাইল। লিভিং স্টাইল।"

"ছন্নছাড়াভাবে থাকা?"

"ছন্নছাড়া বলছিস কেন! একে ছন্নছাড়া বলে না। বলতে পারিস এলোমেলোভাবে থাকা, অগোছালো হয়ে থাকা!"

"বেশ তাই। একগাদা বই কাগজ ছড়ানো, এখানে ভাঙা কাপ, ওখানে মদের বোতল, ও পাশে তোর জামা প্যান্ট ঝুলছে...."

"তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে রে বেটা! ও সব তো আমারই। শোন, ভগবান বলে একটা জীব যদি এই জগৎ সৃষ্টি করে থাকে বলে মনে করিস, দেখবি এরকম ডিসঅর্ডারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট আর কোথাও নেই।"

জহর হাসল। "তুই তাহলে ভগবান!"

"ছোঃ, আমি কেন ভগবান হব, ভগবানই আমি হতে পেলে ধন্য হবে।"

"তা হবে। তোর ওই টি-পটটা ওভাবে গোল টেবিলের মাঝমধ্যিখানে রেখেছিস কেন! অবশ্য ওটা দেখতে সুন্দর। বিলেতি। ওটাকে যদি দেখাতেই চাস, যদিও ওটার

মাথার ঢাকনিটা নেই, কেটলিটাকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখ। টেবিলের ওপর হাবিজাবির সঙ্গে ওভাবে রেখেছিস কেন! ইলেকট্রিক শেভার, টর্চ, চুলের ব্রাশ, পুরনো ম্যাগাজিন, ওষুধের শিশি, মায় পুরনো চিঠি, বিল....!"

"কেটলিটার ভেতরটা দেখেছিস?"

"না সেভাবে নয়।"

"দেখলে কিছু বুঝবি না। বাঘের নখ, বাঁদরের হাড়, আর একটা ছুরি আছে। ছোট্ট, ইঞ্চি দুই-আড়াই সাইজ।"

"জিনিসগুলো জমাচ্ছিস?"

"না। রেখে দিয়েছি। ওটা আমার জাদু-কেটলি। মন্ত্রপড়া। খবরদার ওর মধ্যে হাত দিবি না। দিলেই বিপদ।"

জহর হেসে উঠল।

"হাসিস না। যা বলছি শুনে যা। ওটা আলাদিনের জাদু-লম্ফ নয় রে ভাই। নো ম্যাজিক ল্যাম্প। দৈত্যও বেরিয়ে আসবে না। তবে তোর ঘোর লেগে যেতে পারে। সে বড় বিশ্রী ঘোর। বুঝলি? কেটলির মাথা নেই দেখেছিস। ভেঙে ফেলেছি। কেন ফেলেছি জানিস! মুণ্ডু থাকলেই বিপদ।"

"বুঝলাম।"

"পরে তোকে বলব! এখন তোর আজকের কাজের কথা বল। কখন বেরোবি, কোথায় কোথায় থাকবি, কাজকর্ম শেষ করবি কখন। শচীন শালাকে পেয়েছি কাল ফোনে। শ্রীকান্তকেও কানেক্ট করেছি। অন্যদের কাল পাইনি। আজ পেয়ে যাব দু চার ছাগলকে। তার মানে আজ সন্ধেবেলায় আমরা বসছি। জনা চারেক হয়ে যাবে।"

"বসবি! কোথায় বসবি?"

"দেখি। কোনটা সবাইকার পছন্দ হয়। কাছেও হয়। চৌরঙ্গিতেই বসব কোথাও।"

জহর বুঝতে পারল। হেসে বলল, "তোদের কি সব এক যাত্রা? মানে জলযাত্রা?"

"বলতে ! তবে শচীনটা জলহস্তী। শালার পেটে ট্যাঙ্ক ফিট করা আছে। শ্রীকান্ত হেবি মাতাল। রতন হজম করতে পারে না। এক পেগের বেশি হলেই শালির দুঃখে কেঁদে মরে। তোকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি আছি।"

চা শেষ করে জহর ছাদের দিকে তাকাল। এক টুকরো ফাঁকা ছাদ। জলের ট্যাঙ্কের পাশে একটা বড় গামলা, বড় বড় পাতার একটা গাছ, পাতাগুলো কোনও কোনওটা রঙিন। দুটো কাক ট্যাঙ্কের ওপর লাফাচ্ছে, কয়েকটা চড়ুই নেমেছে ছাদে। রোদ গাঢ় হয়ে আসছিল ক্রমশ।

জহর হঠাৎ বলল, তোকে একটা কথা বলব?"

"এ আবার কি রে! ন্যাকা হয়ে কথা বলছিস কেন? কথা বলবি তা আবার জিজ্ঞেস

করে!" চুনিলাল হাত বাড়িয়ে গোল টেবিলটা থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই তুলে নিল। "বল।"

জহর সামান্য ইতস্তত করে বলল, "তুই এত হুজুগ করছিস কেন। একে ডাকছিস ওকে ডাকছিস! কী হবে?"

"কেন! পুরনো বন্ধুদের তোর দেখতে ইচ্ছে করে না?"

"হয়তো করে, তবে ওভাবে নয়। আমি কলকাতায় দু-চার মাস অন্তর আসি। নিজের কাজে। কাজ সেরে চলে যাই। হঠাৎ হয়তো কাউকে চোখে পড়ে যায়। দু-একটা মামুলি কথা। আমি কিছু ফিল করি না। হাতে সময় থাকলে বড় জোর একবার নন্দুর বাড়ি যাই। নন্দুকে তুই চিনবি না। সিঁদরিতে ছিল এক সময়ে। চাকরি করত। চলে এসেছে। চোখের অসুখে প্রায় অন্ধ। ওকে একবার দেখতে যাই।"

চুনিলাল সিগারেট ধরিয়ে নিল। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করবে ঘরের মধ্যে।

"কারও সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার কখনও হয়নি," জহর বলল। "আগ্রহ থাকলে খোঁজখবর নিয়ে দেখা করতে পারতাম।"

চুনিলাল যেন স্টেজে পায়চারি করছে। হাত পেছনে। এক হাতে সিগারেট। পায়চারি করতে করতে বলল, "নিশ্চয় পারতিস। করিসনি কেন?"

"ওই যে বললাম, আগ্রহ হয়নি।"

"কেন?"

"কেন! .... তা তোকে কেমন করে বোঝাব! হয়নি, মানে সেভাবে হয়নি—বলতে পারি।"

"তুই ওল্ড টাইমার্সদের অ্যাভয়েড করতে চাস! কারণটা কী! নিজেকে তুই ছোট ভাবিস নাকি ওদের চেয়ে? হয় ছোট, না-হয় বড়। তুই যদি বিগ হয়ে যেতিস — বুঝতে পারতাম। কোটি টাকার ব্যবসাদার তুই নয়, তা হলে শিয়ালদার হোটেলে থাকতিস না। আবার তুই পানঅলা বিড়িঅলা সব্জিঅলাও না যে লজ্জায় মরে যাবি। তুই ভাবিস কী! বন্ধুরা সব লাট হয়ে গিয়েছে। ক-চু হয়েছে। দুটো একটা ছিটকে গিয়েছে — হয় মেরিটে না হয় শ্বশুর মেসো পিসে ধরে। বাকি সব লো মিডল। চাকরি, বিয়ে, ছেলেমেয়ে, অর্শ, আলসার....! ওই যে শচীন! ওর কী আছে— তুই ভাল করেই জানিস! ক্যালিবারের মিটার-রিডিংয়ে বসিয়ে দিলে কাঁটা মাইনাসে চলে যাবে। তবে হ্যাঁ— শালা তৈলমর্দনটা বোঝে, কোন পাত্রকে কেমন তেল খাওয়াতে হবে — তাও বোঝে। সেদিক থেকে পাক্কা লোক। ও বেটার তুঙ্গি অবস্থা ভাগ্যের গুণে। ফেলে দে ওকে। বাকিরা তোর আমার মতন।

"যাঃ, তোর অবস্থা—"

"এই তো! যা ভাবছিস তা নয়। আমি কোল্ড স্টোরেজ, রাইস মিল, বা চিট ফাণ্ডের মালিক নই। আমারও চাকরি। মাতুলদের বংশ লোপ পাওয়ায় একটা বাড়ি

পেয়েছি কলকাতায়। সেই বাড়িতে পাঁচ ঘর ভাড়াটে থাকে, পুরনো টেনান্ট, কত ভাড়া হয় জানিস? টোটাল তেরো শো। তা হলে আমি শালা কী! কাপ্তেন?"

জহর কিছু বলল না।

চুনিলাল সিগারেট শেষ করে জানলার পাশে রাখা ভাঙা কাপের চাইদানে গুঁজে দিল।

নীচে রতিবাবুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। বাজার সেরে ফিরে এলেন বোধ হয়। দশরথ কী বলছে। বাসন মাজার মেয়েটিও এসে গেল।

চুনিলাল বলল, "ঠিক আছে। আজ অন্তত তুই বাগড়া মারিস না। ওদের বলেছি সব। লেট আস সিট টুগেদার। তারপর আর নয়।"

"না না, তুই আমায় ঠিক বুঝতে পারছিস না।"

"বেশ পারছি। .... আমাকেও তোর যদি পছন্দ না হয়, চলে যাস—! তবে কাল!"

"কী বলছিস তুই!"

"আমিও তো তোর পুরনো বন্ধু।"

জহর অপ্রস্তুত। লজ্জাও পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল, হাত ধরল চুনিলালের। হেসে বলল, "তোর মধ্যে পুরনো কই! যা আছে সেটা— কী বলব— মনেই আসছে না, তুই যেন আমার জেঠামশাই....তোর যা গার্জেনগিরি—!"

চুনিলাল হেসে উঠল। জহরও হাসছিল।

চুনিলাল বলল, "খোসামোদ করছিস! কেন রে? তোর মতলব কী?"

"কোন মতলব নেই।"

"ভাল। ...তা তোর সেই মানময়ী—"

"মানময়ী আমার কেন হবে! আমি মহিলাকে চিনিই না।"

"কে চেনে?"

"আমায় যিনি চিঠিটা পৌঁছে দিতে বলেছিলেন তিনি। প্রবোধদা।"

"প্রবোধদাটি কে ?"

"তুই চিনবি না। আমাদের ওখানে থাকেন। নিজের একটা বেকারি আছে। পাঁউরুটি, সস্তা বিস্কিট, কেক...."

"ও! মানময়ীর বয়েস কত ?"

"জানি না। দেখিনি তো বলব কেমন করে! যে-বুড়ি চিঠি নিল তার বয়েস চল্লিশের অনেক ওপর তো হবেই। পঁয়তাল্লিশ-আটচল্লিশ হতে পারে।"

চুনিলাল নিজের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল, কায়দা করে কাঁচাপাকা দাঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, "বয়েসটা উপযুক্ত। তোকে তো আবার একবার যেতেও হবে। তাই না?"

"হ্যাঁ, কথা সেই রকমই। চিঠির জবাব নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ওই জায়গাটা আমার সেদিন ভাল লাগেনি। তোর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো আমি ফিরেই আসতাম।"

"না, না, জায়গাটা এখন আর অত খারাপ নেই। কিছু কিছু ছাপোষা গেরস্থ ওখানে থাকতে শুরু করেছে। পেছনে মিলের বস্তি। দু-পাঁচজন ইয়ে যা আছে এখনও তারা ঠিক হায়ার পারচেজ সিস্টমের মেয়েটেয়ে নয়। তাদের কিছু কিছু কাজ থাকে নিজেদের, কেউ নাচ জানে, কেউ টুকটাক অভিনয় করে, কারুর গানটান শেখা আছে। এরা একলা থাকে না। একজন করে গার্জেন রেখেছে। লিভ টুগেদার করে। আজকাল লোকে চালাক হয়ে গিয়েছে, ভাই।"

দশরথ ওপরে চলে এল।

ওরই পেছন পেছন কাজের মেয়েটি।

দশরথ চেল্লাচিল্লি শুরু করল। বেলা হয়ে গিয়েছে; এখনও তার রান্নাঘর বাসি পড়ে আছে।

মেয়েটি বাসনপত্র বার করতে শুরু করল। ছাদে একটা-দুটো করে কাক জমছে। চড়ুইয়ের ঝাঁক উড়ে গেল। কার্তিকের রোদ জানলায় এসে পড়েছে।

চুনিলাল বলল, "তুই কখন বেরোবি?"

"বারোটা নাগাদ।"

"আমার অফিসে আজ একটা মিটিং। ওই বারোটায়। ম্যানেজিং কমিটির দু'জন থাকবে। দুটোর আগেই খেল খতম। আমি চারটে নাগাদ শচীনের অফিসে যাব। তারপর বসার জায়গা ঠিক করে অন্যদের ফোনে জানিয়ে দেব। তোকে পাব কোথায়?"

"বল কোথায় থাকব?"

"কোথায় থাকবি! .....পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে থাক। পারবি। আমি তোকে ঠিক ক্যাচ করে নেব।"

"বেশ।"

সিঁড়ি দিয়ে রতিবাবু উঠে এলেন।"কলকাতায় আর মানুষ থাকবে না। বুঝলেন জহরবাবু, মানিকতলার বাজারেই মাছ ছুঁতে ভয় করে। দামের মা-বাপ নেই। শ'দেড়শো, যা খুশি দর হাঁকে ! যাব কোথায়!" বলতে বলতে ঘরে এলেন ভদ্রলোক।

তিন

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, ঘণ্টা দু-আড়াই তাদের সান্নিধ্য— জহরকে তৃপ্ত করেনি। ওরা কেউ চুনিলাল নয়, চুনির উত্তাপ ওদের ছিল না। একেবারে মামুলি নিছক হাত বাড়ানো, রপ্ত করা হাসি, সাধারণ কুশল বিনিময়, আলগা রসিকতা আর অর্থহীন কথাবার্তা। চুনিকে বাদ দিলে অন্য চার মদ্যপ যেন থিয়েটারের এক দৃশ্যে অভিনয় করে গেল কাঁচা অভিনেতার মতন। শচীন সারাক্ষণ আত্মগরিমা প্রকাশ করল, প্রশস্তি গাইলো তার আমেরিকাবাসী জামাইয়ের। তার ক'টা গাড়ি, কত ডলার উপার্জন তা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। শ্রীকান্ত একতরফা। তার অফিসের বস্‌দের পলিটিক্স আর ক্লিকবাজির কেচ্ছা শুরু করল। রতন সত্যি সত্যি তার ছোট শালিকে নিয়ে পড়ল, শালি একটা চাকরি পেয়ে আগরতলা চলে যাচ্ছে— বিয়েও প্রায় ঠিক, রতন হায় হায় করতে লাগল। আর সলিল শুরু করল রাজনীতি, কী হয়ে গিয়েছে দেশটা দেখতে পাচ্ছিস না? ডার্টি— অল অফ দেম আর ডার্টি। দু-একটা লোক ছাড়া কথা বলতে পারে না। স্ট্যামার করে। তার পর আজ যাকে বলে বাপ, কাল তাকে বলে সাপ। নীতিফিতির বালাই নেই। আর ক্রিমিন্যাল... এ শালা দেশ ক্রিমিন্যালদের রাজত্ব হয়ে গেল।

জহর শুধু শুনেই যাচ্ছিল। দু গ্লাস সফট ড্রিঙ্ক শেষ করার পর করুণ মুখ করে সে চুনির দিকে তাকাল। মানে, আমায় উদ্ধার কর, ভাই।

অন্য ধাতের মানুষ চুনি। বাড়াবাড়ি অবস্থার সময় ধমক মেরে, মুখ খারাপ করে থামিয়ে দিল ওদের। বলল, "নে— অনেক হয়েছে, চুপ কর; তোদের সঙ্গে বসলে আমারই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তোরা হয়েছিস কী! প্রাণের সুখদুঃখ নিয়ে কথা বলতে পারিস না, শালা। আমি তোদের কম দেখলাম না। আমি জানি তোরা কী! চুলোয় যা তোরা। আর আমি বসব না। ওঠ জহর।"

জহরদের ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে আসছিল। চুনিলাল বেশি কথাও বলেনি ট্যাক্সিতে। মেসে ফিরে বলল জহরকে, "কিছু মনে করিস না, আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তোকে টেনে না নিয়ে গেলেই হত।"

জহর বলল, "ছেড়ে দে; এমন হয়।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে চুনি তার টেপ রেকর্ডারে একটা গান চালিয়ে দিল। গজল।

গান শেষ হবার আগে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জহর বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন গানটা শেষ হয়ে গিয়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জহর ফাঁকা ছাদটুকুতে পায়চারি করছিল—চুনি ঘুম ভেঙে উঠে এসে ছাদে দাঁড়াল। "ঘুম হয়েছিল?"

"ভালোই হয়েছিল।"

"জানলার গায়ে শুয়ে থাকিস। জানলা পুরো খোলা থাকে। সোফাটাকে আরও একটু ভেতরে টেনে নিবি। নয়তো কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"আমাদের ও দিকে অনেক বেশি ঠাণ্ডা পড়ে," জহর হাসল, "ঘাবড়াস না।"

"চা খেয়েছিস?"

"না। চা হয়ে গিয়েছে, তুই আয়। একসঙ্গে খাব।"

"আসছি—" বলতে বলতে চুনিলাল বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ঘরে বসে চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। এলোমেলো কথা।

শেষে চুনিলাল বলল, "আজ তোর কাজকর্ম কেমন?"

"বেশি নয়।"

"আমারও তেমন চাপ নেই। কাল শনিবার। শনিবারে আমাদের ছুটি থাকে ধরতে পারিস। আমি অফিস সামলাই আর টাকা টানি। আর্কিটেক্ট ফার্ম। ক্লায়েন্ট আসে না।"

"মন্দ কী!"

চুনি চা খেতে খেতে সামান্য অন্যমনস্ক হল। পরে বলল, "তুই কবে ফিরবি?"

"সোমবার ফিরব ভাবছি। বিকেলের গাড়িতে।"

"ও! তা হলে আজ যাবি? না কাল?"

"কোথায়?"

"তোকে একবার মানময়ীর বাড়ি যেতে হবে না?"

মনে পড়ে গেল জহরের। কথাটা সে ভুলে যায়নি, কিন্তু এই মুহূর্তে মানময়ীর বাড়ির কথাও ভাবছিল না। হেসে বলল, "কেন, তুই বুঝি আজ ওদিকে যাবি?"

"আমার কথা বাদ দে। আমার খুশি হলেই যাই। আজ পারি, কাল পারি। তবে শনিবারে সাধারণত যাই। অনেকে তো ভাই রেসের মাঠে যায়। আমি যাই আমার কুমুদের কাছে।" চুনি হাসল।

"তাহলে কাল তোর—"

"আরে না। সেভাবে ধরিস না। দু-চার দিন অন্তর যেতেই হয়। উপায় নেই। তুই যদি আজ ওদিকে যেতে চাস যেতে পারি, নয়তো কাল।"

"তবে কালই চল। একলা ওদিকে যেতে আমার ভয় করে।"

"ভয়! তুই কি ঝিনুক বাটিতে দুধ খাস নাকি শালা! কিসের ভয়!"

জহর হেসে বলল, "কলকাতায় আসি অবশ্য, নিজের পেটের ধান্দায় আসি।

ডালহাউসি ব্র্যাবোর্ন রোড গণেশ অ্যাভিনিউ—ওই চত্বরে ঘোরাফেরা আর শিয়ালদার হোটেলে ফিরে বড় জোর কলেজ স্ট্রিট। তার বাইরে যাই না। কলকাতার এখনকার হালচাল বুঝি না ভাই। একেবারেই ভূত বনে গিয়েছি। তার ওপর তোর মুখে ওই পাড়াটা সম্পর্কে যা শুনলাম — সাহস হয় না।"

চুনিলাল বলল, "তবে কালকেই চল। আজ সন্ধেবেলায় তোর সঙ্গেই কাটাব। রতিবাবু যাচ্ছে ভুবনেশ্বর, তপন যাবে চাঁদিপুর বেড়াতে। থাকছি আমরা দু'জন। জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

"গল্প আর কম হচ্ছে কোথায়?"

"আরে না, সে রকম গল্প নয়। তোকে অন্য গল্প বলব। ইন্টারেস্টিং। আবার অদ্ভুতও। ধর কুমুদ— আমার হস্তিনী কুমুদিনীর গল্প। আমার গল্প। আবার তোর ওই মানময়ীর গল্পও হতে পারে। তোরও হবে না যে — তাও জোর করে বলতে পারি না।"

জহর যেন অবাক হল। গল্প তো একজনের হয়, এক গল্প দশজনের হবে কেমন করে! চুনি তামাশা করছে। চুনিকে সে চেনে, খানিকটা তো নিশ্চয়। ওর গল্প ধরতে জহরের অসুবিধে হবে না। কিন্তু কুমুদ! কে সে? জহর তাকে চোখেও দেখেনি। বা মানময়ী? তাকেও চেনে না, চক্ষেও দেখেনি জহর। তা হলে এরা সবাই কেমন করে চুনির গল্প হয়ে উঠবে!

জহর বলল না কিছুই।

চুনিলালই বলল, "আজ তাহলে সন্ধেবেলায় আমরা এই ঘরেই বসছি। বুঝলি। আর কাল যাচ্ছি কুমুদদের পাড়ায়। ও কে ?"

মাথা নাড়িয়ে জহর বলল, "তাই।"

সন্ধেবেলায় মুখোমুখি বসে গল্প শুরু হল দু বন্ধুর।

মেস ফাঁকা। দোতলায় রতিবাবু নেই, তপনও নয়। ওদের ঘরের দরজা বন্ধ। তেতলায় চুনিরা মাত্র দু'জন। দশরথের এখন কোনও কাজ নেই হাতে, সে নীচের তলায় গিয়েছে তাস খেলতে। নীচের তলার দারোয়ান পাড়ার দু-চারজনকে নিয়ে তাস জমায়। রোজই। বিড়ি খইনি পান দোক্তার সঙ্গে তাসটা ভালই চলে।

আজ সামান্য সিরসিরে ভাব রয়েছে। কার্তিকের মাঝামাঝি। সামনে কালীপুজো। অল্প ঠাণ্ডার সঙ্গে কুয়াশাও ঘন হচ্ছে আজকাল। বিস্তর দেওয়ালি পোকায় ঘর ভরে যায়। দশরথ একটা সবুজ রঙিন কাগজের ঠোঙা করে ঘরের আলোর তলায় বেঁধে দিয়েছে, তাতেও উপদ্রব বিশেষ কিছু কমেনি পোকার।

চুনিলাল তার গ্লাসের হুইস্কিতে জল মিশিয়ে নিতে নিতে বলল, "জহর, তুই

বরাবর আলোচালের খদ্দেব হয়ে থাকলি, তোর কোনও গতি হবে না। হলেও স্বর্গে নয়। স্বর্গে দেবতারা সুরাভাণ্ড নিয়ে বসে থাকে। তোকে দেখলেই নেড়ি কুত্তার মতন যাঃ যাঃ করে তাড়িয়ে দেবে।"

জহর বলল, "স্বর্গটা আমারও পছন্দ নয়।"

"তাহলে নরকে নামতে পারতিস। তাও তো নামলি না।"

"তুই নেমেছিস?"

"পা হড়কাচ্ছে, নামতে পারি।" বলে গ্লাসটা একবার দেখল, ছোট করে চুমুক দিল একবার। "বেশ ভয় হচ্ছে রে, ভাই। যাক — গল্পটা তোকে বলি।"

জহর বলল, ঠাট্টা করেই, "পতনের গল্প?"

চুনিলাল কথাটা শুনেও যেন উপেক্ষা করল। পরে বলল, "আমার দেখা একটা স্বপ্ন দিয়েই গল্পটা শুরু করি। ভাবিস না আমি বানিয়ে বলছি, কিংবা তোকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে বলছি। যা যা হয়েছে তাই বলছি, বলার সময় কথায় যেটুকু বাহার দেখবি, সেটুকু ছেঁটে দিবি। ও রকম হয় রে ভাই, কথার ঝোঁকে কী বেরিয়ে যায় আটকাব কেমন করে!"

জহর সিগারেট খায় না। মানে তার নেশা নেই। শখ করে কখনও দু-একটা খায়— এই পর্যন্ত। জহর হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা টেনে নিল। "তোর গল্প বল।"

"বলছি। দেখ, বছর তিনেক আগে আমি প্রথম একটা স্বপ্ন দেখি," চুনিলাল বলল। "স্বপ্নটা এমন একটা অদ্ভুত নয় যে মনে রাখতে হবে। ভুলেই গিয়েছিলাম। মাসখানেক পরে আবার। দ্বিতীয়বার দেখার পর আমার মনে হল, আরে এই রকমই না আগেও একবার দেখেছি! সামান্য অবাক হলাম। স্বপ্নে আমি এমন একটা জায়গা দেখলাম — যেটা আগে কখনও আমি দেখিনি। কলকাতা শহরের নানান জায়গা আমার দেখা আছে। বিস্তর অলিগলি পাড়া দেখেছি। মাঝারি পাড়া, পুরনো আমলের গন্ধ-ওঠা পাড়া, আবার ছিটকে ফেটে যাওয়া পচা কাঁঠালের মতন নোংরা পাড়া। সাহেবি আমলের তকতকে পাড়াও আমার দেখা, যদিও সে সব জায়গায় থাকিনি কখনও।"

"কী রকম পাড়া দেখলি?"

"বলছি। এ পাড়াটা যেন সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ঝাপসা হয়ে আছে। স্যাঁতসেঁতে সরু গলি। গলির গায়ে বাড়িগুলো কত পুরনো ময়লা ছেতা-পড়া রং। গা খসে যাচ্ছে, ইট বার করা। ঝুল বারান্দায় পাখির খাঁচা। কোথাও বা রেলিং ঘেঁষে ভিজে শাড়ি সায়া শুকোচ্ছে। ভাঙা জলের পাইপ নেমে এসেছে ছাদ থেকে। একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ছ্যাকরা গাড়ি, গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে — তার পাশে সেই পুরনো আমলের গ্যাস-লাইটের খুঁটি। গলিতে কোথাও কোনও লোক নেই। দুটো কুকুর উঠে বসে আছে রোয়াকে। ... এই পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এমনটা

কেমন করে হয় জহর, যে আমি সেই গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজছি! উঁচু মুখে। খুঁজছি খুঁজছি — খুঁজেই যাচ্ছি। বৃষ্টি এলো আবার। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ভিজে চুপসে গেলাম। এমন সময় দোতলার জানলা খুলে একটা মেয়েছেলে আমায় ডাকতে লাগল।" চুনিলাল চুপ করে গেল।

জহর কথা বলল না। যেন স্বপ্নের বর্ণনা মতন গলিটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করছিল।

চুনিলাল তার হাতের গ্লাসে বার কয়েক চুমুক দিল থেমে থেমে। সামনের প্লেটে পটেটো চিপস, বাদাম ভাজা, কয়েকটা পটেটো চিপস্ মুখে দিল সে। "এই স্বপ্নটা আমি আরও বার কয়েক দেখলাম। দেখতে দেখতে আমার কেমন মনে হতে লাগল, গলিটা আমার চেনা, আমি কোনও-না-কোনওদিন সেখানে গিয়েছি, ওখানকার স্যাঁতসেঁতে, ইটকাঠের নোনাধরা বাতাসের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল। এমন কি ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেও আমি ভিজেছি। আর আচমকা খড়খড়িঅলা একটা জানলাও খুলে গিয়েছিল—!"

জহর বলল, "একই স্বপ্ন তুই রোজই দেখতিস?"

"রোজ নয়। মাঝে মাঝে। স্বপ্নটা আমার কাছে অবসেশনের মতন হয়ে গেল। কেন বার বার ওটা দেখছি বোঝার চেষ্টা করার আগে কী করেছি জানিস?"

"কী?"

"কলকাতায় আমি যেখানে যেখানে থেকেছি, যেসব পাড়ায় যেতাম; বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হাজির হতাম, বা অকারণে কোনও পাড়া দিয়ে হেঁটে গিয়েছি— যা যা আমার মনে পড়ত — সর্বত্রই ঘোরাফেরা করলাম, যদি গলিটা পেয়ে যাই! এমন হতে পারে, কোনও সময়ে দেখা ওই গলিটা হঠাৎ আমার স্বপ্নে এসে গিয়েছে। পুরনো দিন, পুরনো কথা, স্মৃতি তো কত সময়ে স্বপ্নে চলে আসে। কিন্তু এই গলিটার বেলায় আমার দেখা পুরনো কিছুই মেলাতে পারলাম না।"

জহর সিগারেট ফেলে দিল। চুনিলালকেই দেখছিল। সামান্য হেলে তার বিছানায় বালিশে বাঁ হাতের কনুই ভর দিয়ে বেসে আছে। চোখমুখ স্বাভাবিক, নেশার ঝোঁক তাকে পায়নি এখনও।

"তখন ভাবতাম, ধ্যুত শালা, আমার কি মাথার ব্যারাম হ'ল নাকি," চুনিলাল বলল, "পাগলা হয়ে যাব! ভুলে যাব গলিফলি। ভুলেও যেতাম মাঝে মাঝে, আবার একদিন দেখতাম চাগিয়ে উঠেছে। নিজেকেই নিজে ঠাট্টা করে বলতাম, এ হল জন্মান্তরের স্মৃতি। যাকে নাকি বলা হয় 'রেসিয়াল মেমারি'। দূর ও সব কে মানে! ফরগেট ইট। ....তুই কি ভাবিস আমি সাত্যি সত্যি জন্মান্তর মানি, না বিশ্বাস করি! ও সব ফালতু ব্যাপার কে মানে!" চুনিলাল হাতের গ্লাস রেখে দিল। শেষ হয়ে গিয়েছে।

গ্লাস রেখে কয়েকটা বাদাম তুলে মুখে দিল। ধীরে সুস্থে আবার তার নেশা তৈরি করে নিল। সিগারেট ধরালো।

"একদিন — অন্তত দেড় বছর পরে আচমকা এক কাণ্ড হল, "চুনিলাল বলল. "জগৎটা বড় অদ্ভুত রে, জহর। ....তখন তোর শ্রাবণ মাস। আমাদের অফিসের একটা ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল। কথা দিয়েছিলাম, যাব। তা যার সঙ্গে যাবার কথা, আমার এক কোলিগ— হেমদা, সে শালা ফুড পয়জনে ধসে গেল বিছানায়। বরানগরের দিকে বিয়ে বাড়ি। আমি একাই গেলাম। পথে বিপত্তি. ট্যাক্সিটা বেমক্কা অ্যাকসিডেন্ট করে অচল হয়ে গেল। বড় অ্যাকসিডেন্ট নয়। কিন্তু গাড়ির ব্রেকটি গিয়েছে।" একটু থামল চুনি, টান দিল সিগারেটে, বলল. 'তা আমি হাঁটতে লাগলাম। কাছাকাছি রিকশা পেলে ধরে নেব। যেতে যেতে হঠাৎ একেবারে হঠাৎ—বাঁয়ে একটা গলি দেখলাম। গলি আর তার মুখে একটা গাছ। বিলিভ মি, তেঁতুলগাছ। ডালভাঙা, বাজপড়া গাছ যেন। আমি জানি না কেন, কী হল, গলিটা আমায় যেন টানতে লাগল। ...তুই ঠিক বুঝতে পারবি না, ওই টানে যেন কোনও জাদু ছিল। অনেকটা যেন হিপনোটাইজড হয়ে, কিংবা বলতে পারিস মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এগিয়ে গেলাম।"

"সেই গলি?"

"হ্যাঁ, একেবারে সেই গিল, আমার স্বপ্নে দেখা। সেই রকম বাড়ি, সেই রোয়াক, ওপরের বারান্দায় ভেজা শাড়ি জামা, ঝিরঝিরে বৃষ্টিও নেমে গেল, গ্যাস লাইটটা অবশ্য দেখলাম না। কিন্তু একটা ছ্যাকরা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ঘোড়াগুলো যেন কঙ্কাল। আমি তখন এত হতভম্ব, স্তম্ভিত যে আমার চেতনাই কাজ করছিল না। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছি — ধুতি পাঞ্জাবি লেপটে যাচ্ছে গায়ে. — তবু হুঁশ নেই।" চুনিলাল এবার গ্লাসে চুমুক দিল।

জহর অবাক হয়ে শুনছিল, চুনির দিকে তাকিয়ে থাকল।

"মানুষের কখন কী হয় বলা মুশকিল—" চুনি বলল, "প্রথম ঘোরটা কেটে যাবার পর আমি কেমন অস্থির, উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। আমার যেন খেয়াল হল, বৃষ্টিতে আমি ভিজে গিয়েছি। সঙ্গে ছাতা ছিল, কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ভুলে ফেলে এসেছিলাম। তখন আর ভেজা ছাড়া উপায় ছিল না। একটু কোথাও দাঁড়াতে পারলে বেঁচে যাই ভেবে আশপাশে তাকাচ্ছি, ঠিক তখনই একটা বাড়ির জানলা খুলে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল। জানলায় আলো এসে পড়েছে। দেখি একটা মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে গলিটা দেখছে। দেকতে গিয়ে আমাকে চোখে পড়ল। কী হল কে জানে! মেয়েটি আমাকে হাত নেড়ে ডাকল। ডাকতে লাগল। আমিও বাড়িটার সদরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর সদর খুলে সে যখন আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল তখন আমি হয়তো পুরোপুরি সজ্ঞানে ছিলাম না। ওই মেয়েটিই আমার কুমুদ। কুমুদিনী।" চুনি

হঠাৎ থেমে গেল। হাসল। "যা বললাম তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তুই বিশ্বাস কর, আর না-কর। তোকে আমি নিয়ে যাব কুমুদের কাছে। জিজ্ঞেস করবি।"

চার

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জহরের অস্বস্তি হচ্ছিল। সেকেলে সিঁড়ি, উঁচু উঁচু ধাপ, সিমেন্ট নেই, শুধু ইটের জোড়, তবে শক্ত। টিমটিমে এক বাতি জ্বলছিল সিঁড়ির মাঝমধ্যিখানের বাঁকের মুখে। লোহার শিক-দেওয়া রেলিং। মাঝে মাঝে শিক উঠে গিয়ে ফাঁকা হয়ে আছে জায়গাটা।

জহর যে ইতস্তত করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে বুঝতে পেরে চুনিলাল হেসে বলল, "ওরে শালা ভয় পাস না। আমি দেবদাসের চুনিবাবু নই। তোকে খারাপ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি না।"

জহর কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তুই ওঠ।"

দোতলায় উঠে ঢাকা বারান্দা। একেবারে সরু নয়। গরাদ দেওয়া রেলিং। বারান্দার গায়ে গায়ে দু-তিনটে ঘর।

"কুমুদ!" চুনিলাল ডাকল।

মাঝের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কুমুদিনী।

"এই যে একে নিয়ে এলাম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু জহর। লেখাপড়াও একই সঙ্গে করেছি, তবে আমার তো স্কুল-কলেজ পালানো বিদ্যে। এরা ছিল মন্দের ভাল।"

জহর কুমুদিনীকে দেখছিল। দেখে অবাক হচ্ছিল। চুনির কথায় রসিকতার বাহুল্য থাকে ধরে নিয়েও জহর ভাবেনি এতটা পার্থক্য হতে পারে। কুমুদ হয়তো খানিকটা গোলগাল গড়নের, তবে তাকে ঠাট্টা করেও হস্তিনী বলা যায় না।

কুমুদ বলল, "আসুন।" বলে মাঝের ঘরে ডাকল না, পাশের ঘরে, প্রথম ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বসাল। বাতি জ্বেলে দিল। দেওয়ালে কোথাও টিউবলাইট নেই, দুই দেওয়ালে শেড়্-পরানো সাধারণ আলো। পাখা আছে। চালাবার দরকার হল না।

ঘরটা মাঝারি গোছের। এক পাশে বাহারি ছোট চৌকি বা তক্তপোশের ওপর পরিষ্কার করে গদি পাতা। গদির ওপর সুজনি। অন্যপাশে একজোড়া বাহারি চেয়ার। লম্বা মতন একটা কাঠের স্ট্যান্ড। তার ওপর পেতলের গোল ফুলদানি। ফাঁকা আসবাব বলতে আর কিছু নেই তেমন, একটা ছোট দেরাজ অবশ্য আছে একদিকে। ঘরের জানলার পাল্লা খড়খড়ি-দেওয়া।

"বসুন," কুমুদ বলল।

চুনিলাল চেয়ারে বসল না, গদিতে গিয়ে বসে পড়ল।

জহর কোথায় বসবে ঠিক করতে না পেরে চুনির কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়ল।

কুমুদ তখনও দাঁড়িয়ে।

জহর কুমুদকে দেখছিল। ঘরের আলো জোরালো নয়, আবার টিমটিমেও না। এই আলোয় অত্যন্ত স্পষ্ট করে না হলেও কুমুদকে দেখতে অসুবিধেই হচ্ছিল না; এমনকি দেওয়ালে ঝোলানো এক জোড়া ছবিও। ছবি দুটোই নদনন্দী পাহাড়ের। ফুলের প্রান্তরও চোখে পড়ে। কোন পাহাড়তলির কাছাকাছি হতে পারে জায়গাটা। অত ফুল।

কুমুদের দিকে তাকাল জহর। গোল মুখ। ঈষৎ মোটা নাক। চোখ দুটি ডাগর। ঘন ভুরু। গায়ের রং বেশ ফরসা। গলায় হার। শাড়িটা সাধারণভাবে পরা। তাঁতের হালকা রঙের শাড়ি। জহরের মনে হল, কুমুদের বয়েস বছর চল্লিশের নীচেই। সে আর ঠিক যুবতী নেই, ভাটা পড়ার চেহারা যেন।

চুনিলাল বলল, "বুঝলে কুমুদ, সেদিন তোমার এখান থেকে বেরিয়ে গলির প্রায় মুখে গিয়েছি, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা। চোরের মতন গলিতে ঢুকে সাতাশের এক বাড়ি খুঁজছে। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। অনেক বছর পরে দেখা তো! তায় আবার এই গলিতে, সন্ধের পর। আমি মাতাল হবার পাত্র নই। ভদ্দরলোকের মতন খাই, ভদ্দরলোকের মতন রাস্তা হাঁটি। তবু একটু নেশা-নেশা চোখ ছিল বইকি! কথা বলতে বলতে মনে হল, এই মালকে যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। বললাম, জহর নাকি! মাল একেবারে হাঁ হয়ে গেল। শালা ভাবেইনি — এইভাবে ক্যাচ্ হয়ে যাবে।" চুনি হাসতে লাগল, অট্টহাসি। হাসতে হাসতেই বলল, "শালাকে তখন সাতাশের এক বাড়ি খুঁজে দিতে হল। তোমাদের এই গলিতে কোনটা সাত কোন্‌টা সাতাশ কার বাপের সাধ্যি বোঝে! আর আমি তো ভাই তোমার নম্বরটি ছাড়া অন্য কোনও নম্বর চিনি না।"

কুমুদ একটু হেসে বলল, "কে থাকে সাতাশের এক বাড়িতে ?"

"মানময়ী..." চুনিই বলল।

"ও বুঝেছি! মানুমাসি। মানুমাসির তো অসুখ শুনেছি। বুকের অসুখ। হার্ট খারাপ। ওর মেয়ে রত্না বরানগরের একটা নার্সিংহোমে কাজ করে।" কুমুদ বলল জহরের দিকে তাকিয়ে। "ওই বাড়িতে হঠাৎ....."

জবাবটা চুনিলালই দিল। বলল, "জহর একটা চিঠি বিলি করতে এসেছিল! এই দেখো, তোমায় তো বলাই হয়নি, জহর কলকাতায় থাকে না, বাইরে থাকে। সিঁদরি। সেখানে বেটা একটা ব্যবসা করে; পাম্প সেট্ মানে জল তোলার পাম্প মোটর গছায় খদ্দেরকে, ডোমেস্টিক জেনারেটারের পার্টস বিক্রি, সারাই-সোরাই—। ওখানে এক ভদ্রলোকের চিঠি পৌঁছে দিতে এসেছিল তোমাদের মানুমাসিকে।"

"কাজ হয়েছে?"

জহরই এবার জবাব দিল। বলল, "একটি মাঝবয়েসী মেয়েলোকের হাতে চিঠিটা দিয়ে এসেছি। মহিলা নিজে নীচে নেমে আসতে পারেননি।"

"কেমন করে পারবে! শরীর খুবই খারাপ শুনেছি। চিঠি তাহলে অন্য কেউ নিয়েছে।"

চুনিলাল বলল, "জহরকে যে জবাবও নিয়ে যেতে হবে। কে দেবে?"

"কেমন করে বলব! দেবে কেউ। ....তোমরা কি এখনই জবাব নিতে বেরোবে—?" কুমুদ ঠাট্টার গলায় বলল।

"দূর! সে পরে হবে....। এখন আমরা তোমার কাছে। কথাও আছে। কই, ব্যবস্থা করো কিছু। জহর কিন্তু মদটদ খায় না। ভেরি গুড্ বয়। মরালিস্ট। আমরা ছেলেবেলায় শালাকে গব্যঘৃত বলতাম। ওর হল বিধবার কারবার। ওকে তুমি চা-টা খাওয়াও, পারলে সন্দেশ রসগোল্লা....!"

জহর কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কুমুদ বলল "কোনও আমিষই চলে না?"

"না না, শালা অতটা বোস্টম নয়। ডিম মাছ মাংস খায়—"

"বসুন, আসছি।" কুমুদ চলে গেল।

জহর আবার ঘরটা দেখতে লাগল। আগে খেয়াল করেনি, এবার চোখে পড়ল, ঘরের এক কোণে একটা পুরনো দিনের বক্স গ্রামোফোন, মাথার ওপর লেসের ঢাকা, পাশে রেকর্ডের বাক্স।

চুনিলাল সিগারেট ধরাল। "কেমন দেখছিস রে?"

জহর তাকাল বন্ধুর দিকে। "তুই তিলকে তাল করিস! বললি হস্তিনী...."

"নয়? বলিস কী? ওজনে ষাট সত্তর ছাড়িয়ে যাচ্ছে -- মানে যাবে আর ক'দিন পরেই। গোছ দেখেছিস পায়ের? ঊরুফুরু কলাগাছ হয়ে গেল। দু'বছর আগে ভাই, এই কুমুদ অন্য কুমুদ ছিল। রিয়েল কুমুদিনী। সেই পদ্যটা পড়তাম না একসময় — সরোবরে শোভে এক কুমুদিনী ওই ...তারপর — তারপর কী যেন!"

জহর পদ্য নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "তোর এই কুমুদও তো ভাল রে!"

"আরে বাব্বা! তুই এমনভাবে বলছিস — যেন আমার বউয়ের মুখ দেখে কথা বলছিস! মোহর দিবি নাকি !"

"তুই এত বাজে কথা বলিস—!"

চুনিলাল হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "কুমুদকে খুশি করে তোর লাভ হবে না শালা। আমার সঙ্গে ওর একটা আলাদা সম্পর্ক! একদিনে তুই আর কী বুঝবি! তবু নজর করে যা—!"

জহর যেন ঘাড় হেলিয়ে আগেভাগেই কথাটা স্বীকার করে নিল।

চুনিলালরা গদির ওপরে বসেই খাওয়া-দাওয়া শুরু করেছিল। কুমুদ কাছেই। একটা গদিমোড়া নিচু চৌকি টেনে বসেছিল সে।

চুনিলাল বলল, "কুমুদ, তুমি কি সেদিনের কথাটা একটু বলবে? এই গলিতে আমি কীভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম বৃষ্টিতে, সন্ধের পর পর হবে সময়টা, গায়ে আমার ধুতি পাঞ্জাবি, বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন খেতে যাবার পোশাক; সমস্ত গলি ফাঁকা, আলোও ঝাপসা হয়ে আছে, এমন সময় তোমার বাড়ির রাস্তার দিকে জানলা খুলে তুমি যেন কী দেখতে গিয়ে আমায় দেখে ফেললে, তারপর হাত নেড়ে ডাকলে। কী, ডেকেছিলে না?"

জহর মুখ তুলে কুমুদের দিকে তাকাল। চুনিলালের কথা সে অবিশ্বাস করেনি, তবু পুরোপুরি মানতেও বাধছিল।

কুমুদ মাথা হেলিয়ে নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। গলিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলে দেখলাম, ডাকলাম।" কুমুদের মাথায় বিনুনি-বাঁধা খোঁপা। খোঁপার মাঝমধ্যিখানে রুপোর বাহারি কাঁটা।

চুনিলাল গদির ওপর থাপ্পড় মেরে জহরকে বলল, "দেখলি শালা, শুনলি নিজের কানে! চুনি বিশ্বাস মিথ্যে গপ্প ঝাড়ে না।"

জহর বলল, "আমি কি বলেছি, তুই মিথ্যে বলছিস!"

"মুখে না বললেও তোর মন মানছিল না। আমি যে স্বপ্নের কথা বলেছি — সেটাও কি তুই সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছিস!"

জহর মুখ ফিরিয়ে কুমুদের দিকে তাকাল। "ও একটা স্বপ্নের কথা বলে, গলির স্বপ্ন, যে-গলি আগে ও দেখেনি কোনোদিন, গলিটা ওকে ঘোরের মতন পেয়ে বসেছিল, খুঁজেছে অনেক, শেষে সেদিন আচমকা পেয়ে গেল।"

কুমুদ বলল, "জানি। আমি অনেকবার শুনেছি।"

জহরের হঠাৎ তর্কের ঝোঁক চাপল। বলল, "কিন্তু স্বপ্নে সে আপনাকে দেখেনি।"

চুনিলাল বলল, "সো হোয়াট! আমি বলেছি — একটা মেয়ে আমায় জানলা খুলে ডেকে নিয়েছিল। বলেছি তো!"

"বলেছিস!"

"তবেই হল। এরপর তুই যদি বলিস মেয়েটা ছুঁড়ি, না ডবকা, না বুড়ি — তা আমি দেখিনি — কাজেই স্বপ্নটা রিজেক্ট হল — তবে শালা কী আর বলব!"

জহর হাসল। শব্দ করে নয়। বলল, ঠাট্টা করেই, "ঘোড়ার গাড়িটাও ছিল নাকি?" বলে কুমুদের দিকে তাকাল, "ছ্যাকরা গাড়ি। কলকাতায় আর কী ওটা আছে?"

কুমুদ গায়ের কাপড় গোছাতে গোছাতে বলল, "ওটা সাহাবাবুর গাড়ি। উনি আলমবাজারে থাকেন। দু-তিন পুরুষের বনেদি বাড়ির মানুষ। বয়েসও হয়েছে

অনেক। ভাল ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খুব নাম ছিল, পসারও ছিল। বয়েস হয়ে গিয়েছে বলে এখন আর রোগী দেখতে বাইরে যেতেন না। ধরাধরি করলে যদি এক-আধজনকে দেখতে আসেন। সেদিন সতীশদাদুকে দেখতে এসেছিলেন। সতীশদাদুর বয়েস আশির ওপর, নড়তে চড়তে পারেন না। শেষ অবস্থা। দাদুকে উনি দেখে গেলেন যেদিন তার সাত দিনের মাথায় চলেও গেলেন দাদু।"

"ওঁর গাড়ি?"

"হ্যাঁ। কোথাও যেতে হলে নিজের পালকিগাড়িতেই যেতেন উনি। ওঁদের আলমবাজারের বাড়িতে তখনও একটা আস্তাবল ছিল।"

চায়ের কাপ সরিয়ে রাখল জহর।

চুনিলাল বলল, "কীরে? মিলছে?"

জহর মাথা নাড়ল। মিলছে। হঠাৎ বলল, "তুই না বলেছিলি গলিতে একটা সেকেলে গ্যাসলাইট দেখেছিস?"

"ওটাই মিলবে না। তবে একেবারেই মিলবে না — তা নয়। গ্যাস-লাইট না থাকুক লোহার পোস্টটা ছিল। তাই না কুমুদ?"

কুমুদ বলল, "আছে এখনও। লোহার খুঁটিটা।"

জহর মুখ মুছে নিল। না, সে আর স্বপ্নের সত্যিমিথ্যে নিয়ে তর্ক করবে না। যেন কথাটা পালটে নিতেই বলল, "সেই ডাক্তারবাবু আছেন এখনও?"

"না। এই চৈত্রমাসেই গত হয়েছেন। ওঁরও আশির কাছাকাছি বয়েস হয়েছিল। মানুষটি ছিলেন বড় ভাল। দানধ্যানও আছে অনেক। বাড়িতে একটা মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন — কৃষ্ণমন্দির। জন্মাষ্টমীতে ধুমধাম করে পুজো হত। এখনও হয়।"

চুনিলাল বলল, "সতীশ ঠাকুরের কথাটাও বলে দাও।"

"উনি গাইয়ে মানুষ ছিলেন। টপ্পা গাইতেন। ওঁদের কালে নামকরা গাইয়ে। গানও শেখাতেন থিয়েটারে। পরে অসুখ করল। আট-দশ বছর ভুগেছেন, একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন শেষের দিকে।"

জহর হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে একটা পান তুলে নিল। পান সে মাঝে মাঝে খায়।

চুনি বলল, "তা এবার তুই কী করবি? ও বাড়িতে যাবি নাকি? মানময়ীদের বাড়িতে। তোকে জবাব আনতে হবে না?"

জহরের খেয়াল হল। যাওয়ারই কথা। এখানে আসার একটা কারণ তো চিঠির জবাব নিয়ে যাওয়া। কিন্তু একা একা কি যাওয়া যাবে! মনে আছে অন্ধ গলিটা?

"বাড়িটা পেছনের দিকে না? যাবার সময় বাঁ হাতি পড়বে?"

কুমুদ বলল, "আমি লোক দিয়ে দেব?"

বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল জহরের, এই গলির ব্যাপারটা তার কাছে এখনও রহস্যময়।

লোকজন আছে গলিতে, তবু ভিড় কম, ফাঁকা ফাঁকা, দোকানপত্রও খোলা ছিল দু-একটা — আসার সময় দেখেছে। আবার বাজে ছেলে, ঝুল বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়া দুটো মেয়ের হাসিও কানে গিয়েছে।

কুমুদের বাড়িতে লোক আছে সে আগেই দেখেছে। একজন কাউকে পেলে ভালই হয়। বলল, "সুবিধে হয়। যাবে কেউ?"

"কেন যাবে না! শশীদিকে দিচ্ছি, বাড়ির ভেতরে গিয়ে খবর দিতে পারবে। বসুন আপনি। আসছি।" কুমুদ উঠে গেল।

চুনিলাল হাসছিল।

"হাসছিস?"

"তুই এত ভীতু! নিজে একটা বাড়িতে যেতে পারবি না?"

"পারব না কেন! তবে এই গলিটা যেন কেমন! তুই আবার যা শুনিয়ে দিয়েছিস—"

"আরে সে কবে কী ছিল এখন তার কী! এখন ভদ্দর হয়ে গিয়েছে। আর তোকে কী করবে! তুই কচি খোকা!"

জহর কান করল না চুনির কথায়। "তুই এখানে কতক্ষণ থাকবি?"

"যতক্ষণ না তুই ফিরে আসছিস।"

"আমি তাড়াতাড়ি আসব। ....চিঠির জবাব যদি লিখে রাখে — তবে জবাব নিয়েই ফিরে আসব।

"না হলে একটু দেরি হতে পারে। হোক। তুই ভাবিস না।"

কুমুদ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জহরকে ডাকল। "আসুন।"

উঠে পড়ল জহর।

বাইরে এসে দেখল, মাথায় সামান্য কাপড় দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বয়েস হয়েছে মেয়েটির।

"আপনি শশীদির সঙ্গে যান। আমি বলে দিয়েছি সব।"

জহর বারান্দা দিয়ে দু-চার পা এগিয়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। "আমার ভেতরে যাবার দরকার কী! চিঠির জবাবটা পেলেই চলে আসব।"

"যান আগে। দেখুন। মানুমাসি কি লিখতে পারে? রত্না বাড়িতে থাকলে লিখে দেবে। ও তো রোজই এসময় থাকে না। ডিউটি থাকলে পাবেন না। দেখুন—!"

জহর কোনও কথা বলল না আর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

পাঁচ

জহরই ট্যাক্সি ধরেছিল।

বড় রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই পাড়ার কালীপুজো। আজ থেকেই রাস্তার দু'পাশে আলোর খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে বড় রাস্তার মুখের কাছটাতেই যা ফোয়ারা ছুটছে আলোর নয়তো ডান দিকের গলি ধরেই যত সাজসজ্জা তখন। পুজো ওই গলির মধ্যে কোথাও। হল্লা তেমন শোনা যায় না। হয়ত এখনও প্রতিমা আসেনি বলে। পরশু পুজো। মাঝে মাঝে পটকা ফাটছে। হুস্ করে একটা হাউই উঠে গেল আকাশে।

দেখতে দেখতে জায়গাটা পেরিয়ে এল ট্যাক্সিঅলা। এবার আর আলোর খেলা নেই, কোলাহলও নয়। বাস আসছে উল্‌টো দিক থেকে, ট্যাক্সিটা বাঁয়ে সরে গেল।

চুনিলাল বলল, "কলকাতায় এখন মা কালীর আর শনির ডিম্যান্ড বেশি। তোদের ওখানে?"

"কালীপুজো হয়, তবে দেওয়ালির ব্যাপারই বড়। বিজনেসে সেন্টার, নন বেঙ্গলি নাইন্‌টি পার্সেন্ট, ওদের অনেকেরই বিজনেস-ইয়ার দেওয়ালি থেকে।"

"তুই কি সেই জন্যেই কাল ফিরতে চাস?"

"কাল হয়তো হবে না। পরশু ভোরেরট্রেন ধরব হাওড়ায় গিয়ে।"

"তাই ধরিস। ....আবার কবে আসবি?"

"ঠিক নেই। কাল প্যাটেলদের কমারসিয়াল ট্রেডিংয়ে গিয়ে বুঝতে পারব। দরকার পড়লে পরের মাসেও আসতে পারি, নয়তো তিন-চার মাস পরে। আমার মুশকিল কী জানিস, দোকানে একটা লোক আছে। কাজকর্ম শিখিয়ে একটা মিস্ত্রিকেও রেখেছি, কিন্তু নিজে না দেখলে ঠিক চলে না। ওরা কাজটা চালিয়ে দেয়, তার বেশি আর কী করবে!"

"যাক, তোকে যা বলেছি — আবার বলছি — কলকাতায় এলে আর হোটেলে উঠবি না, সোজা আমার ওখানে। বুঝলি?"

জহর হাসল। "বুঝলাম।"

"এবার সাফসুফ বল তো, তোর ওই মানময়ীটি কে? ...তুই ফিরে আসার পর তোর চোখ মুখ দেখে মনে হল, ডিস্টার্বড্। কুমুদের সামনে তোকে আর জিগ্যেস করিনি। কে ওই মানময়ী?"

জহর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কাশল বার কয়েক। বলল, "আমি ঠিক করেছিলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকব না, কুমুদের বাড়ির মেয়েটি গিয়ে চিঠির জবাব নিয়ে আসবে। ও ভেতরে গেল, আমি সদরের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর দেখি মেয়েটি ফিরে এসে আমায় বলল, ওপরে আমায় ডাকছে। গেলাম। ঘরবাড়ির চেহার

দেখে মনে হল, কোথায় যে যাচ্ছি কে জানে, চিৎপুরের কানাগলিতেও এর চেয়ে আলো বাতাস বেশি। কাঠের সিঁড়ি, মাঠকোটা বাড়ির মতন চেহারা বাড়ির, অন্ধকার, ইঁদুর বিছে—সবই থাকতে পারে, বাসি গন্ধ, নীচে বোধ হয় জঞ্জাল পচছে। দোতলায় এক মহিলাকে দেখলাম। তক্তপোশে পাতা বিছানায় বসে হাঁফাচ্ছে। চিট বিছানা, একটা টুলের ওপর কীসব পড়েছিল। বোধহয় কবিরাজি মালিশ ওষুধ বিষুধ।"

"বুড়ি নাকি?"

"একরকম তাই। ....কথাই বলতে পারে না, হাঁফায়। শেষে বলল, চিঠির জবাব দেবার কিছু নেই। ওকে বলো, আমার টাকার দরকার নেই। ওর টাকা আমি ছুঁতে চাই না। এতগুলো বছর যদি আমাদের ভাত-কাপড় জুটে গিয়ে থাকে, বাকি ক'টা দিনও উনি জুটিয়ে দেবেন — মাথার ওপর যিনি আছেন। আর বলো, নিমের পাতা তেতোই হয়, চিনির রসে ডুবিয়ে তাকে মিষ্টি করা যায় না। ....এই কথাগুলোই বলো ওকে। আর আমার বলার কিছু নেই। জবাব যা দেবার দিয়ে দিলাম।"

চুনিলাল পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করল। কৌতূহল-বোধ করছিল। "বলিস কী! এ তো একেবারে কড়া টাইপ রে! বয়েস কত আন্দাজ করতে পারলি না? পঞ্চাশ পেরিয়েছে?"

"হবে। মাথার চুল অর্ধেক সাদা।"

"তবে মিনিমাম পঞ্চাশ হবে। ....তা তোর সেই চেনা ভদ্রলোক — যার চিঠি পৌঁছে দিতে এসেছিলি — কী নাম যেন —?"

"প্রবোধদা। প্রবোধ গুপ্ত।"

"কে হয় প্রবোধ ওই মহিলার?"

"জানি না। আমায় কিছু বলেনি।"

"তার বয়েস কত?"

"পঞ্চান্নর বেশি। সাতান্ন আটান্ন হবে।"

"মানময়ীর স্বামী কিংবা পুরুষ ছিল নাকি?"

"আমায় তো কিছু বলেনি। শুনিনি কোনোদিন।"

চুনিলাল সিগারেট ধরিয়ে নিল। ট্যাক্সিটা এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল। টেম্পোর মাথায় প্রতিমা চাপিয়ে একদল ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে। টেম্পোটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই পাশের বিরাট একটা গাছ — অশ্বত্থ বা পাকুড় হতে পারে— অন্ধকাব ছড়িয়ে দিল যেন। এখানে পর পর অনেকগুলো বাতি জ্বলছে না। রাস্তা দেখা মুশকিল। আলো ছড়িয়ে ট্যাক্সিটা এগুতে লাগল।

চুনিলাল বলল, "তোর প্রবোধদাকে কতদিন চিনিস?"

"পাঁচ-সাত বছর। আমাদের বাড়ির কাছে ঠিক থাকে না। মাইলটাক দূরে থাকে।

পুরনো একটা বাড়ি। মাথায় টালির চাল। তারই একপাশে প্রবোধদার বেকারি।"

"আগে কী করত? ফ্যামিলিম্যান?"

"ফ্যামিলিম্যান বলতে — বউ আছে, লোকাল ক্রিশ্চান একটি মহিলা, সুশীলা। ছেলেমেয়ে নেই। সুশীলাবউদিরও বয়েস হয়েছে। বেকারিটা সেই দেখাশোনা করে। মানে বেকারির কাজকর্ম। আর প্রবোধদা বেকারির কাজ ছাড়াও বাইরে বাজারে ঘোরে, রুটি বিস্কিট টিফিন কেক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা দেখে, টাকাপয়সা কালেক্ট করে। ওরা তো ভালই আছে। আমি অন্তত গোলমাল দেখিনি।

"আগের হিস্ট্রি কী? জানিস না?"

"সেভাবে জানি না। এক সময়ে আদরায় ছিল বলেছে। রেলে কাজ করত। কী খেয়াল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল।"

চুনিলাল সিগারেট ঠোঁটে রেখেই বলল, "লোক কেমন?"

"ভাল বলেই জানি।"

"তুই জানিস 'ভাল'। আর মানময়ী জানে অন্যরকম। নয়তো ওভাবে জবাব দেয়। ....একেই বলে ডিফারেন্ট ফেসেস্ অফ্ এ ম্যান। আমাদের জীবনটা কেমন জানিস? জলে থাকলে মাছ, ডাঙায় থাকলে বাঁদর, আকাশে উড়লে পাখি!" বলে হাসতে লাগল চুনিলাল। হাসতে হাসতেই বলল, "তোকে ঠিক বোঝাতে পারলাম না; আসলে জীবনের কোনও একটা নির্দিষ্ট পরিচয় নেই, এক একজনের কাছে এক এক রকম, এক এক অবস্থায় এক ধরনের। আমি তোকে বাজি ফেলে বলতে পারি, তোর ওই প্রবোধদা মানময়ীর কাছে অত্যন্ত বাজে বজ্জাত দায়িত্বহীন নিষ্ঠুর একটা মানুষ। আর তোদের কাছে, তোর সুশীলাবউদির কাছে — বেশ ভাল লোক। কেউ তোরা আসল মাল চিনিস নারে!"

জহর বলল, "তুই যাই বলিস আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মানময়ী ওভাবে কথা বললেন কেন! জানি না তাঁর রাগের কারণটা কী, কিন্তু অত কথা না বলে এক কথায় সেরে দিতে পারতেন। চিঠিতে কী লেখা ছিল আমি জানতাম না। আমার আগ্রহও ছিল না জানার....। মহিলার ওরকম কথাবার্তা শুনে খারাপও লাগল।"

"রত্নাকে দেখলি না?"

"না।"

"কোথায় গিয়েছে বলল না?"

"না। আমি জানতেও চাইনি।"

"ছেড়ে দে। এখন আর সাতাশের এক নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তবে তুই জেনে নে, ও বাড়ির মিস্ত্রি আমি বার করে নেব। কুমুদ নিশ্চয় জানে, না জানলে খোঁজ করে নেবে।"

জহর বলল, "তাতে আর আমার কী! ওদের মধ্যে আমার নাক গলাবার দরকাব নেই।

"নাক গলাবি কেন! চিনে রাখ। মানুষ চেনায় মজা আছে—" চুনিলাল হালকাভাবে বলল, হাসির ঢঙে, "তবে কতটুকু আর চেনা যায়! ব্যাপারটা কী জানিস জহর, মানুষগুলো দেখতে ছোট, সাইজে স্মল, চেহারায় হাতি নয়, বাঘ-সিংহ নয়, কুমির নয়; — কিন্তু শালাদের ভেতরে যেন এক একটা আফ্রিকার জঙ্গল লুকিয়ে আছে। কোথায় যে কত অন্ধকার তুই বুঝবি না, জানতে পারবি না — কোন অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে কী জাতের ওআইল্ড অ্যানিমাল লুকিয়ে বসে রয়েছে, কোন বেটা কখন তোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!"

জহর হাসল যেন। "কুমুদ কি তোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল?"

"দূর শালা! কুমুদ লাফাবে কেন! ওর সে ক্ষমতা কোথায়, বরং বলতে পারিস আমিই ওকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। ...না ভুল হল, পেয়েছি বটে তবে সেটা স্বপ্নে....!"

"সেটা শুনেছি। বাকিটা চেপে আছিস।"

চুনিলাল হেসে উঠল। "বলব তোকে। ....বিশ্বাস করলে করিস, না করলে করিস না। আমি যা বলব তা মিথ্যে নয়। আর তোর কাছে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী! তুই তো আমার গল্প নিয়ে সিনেমা করবি না, শালা।"

রাত্রে নিজের ঘরে বিছানায় বসে চুনিলাল তার গল্প শুরু করল।

বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। আজ বুঝি ত্রয়োদশী। পাড়ায় কালীপুজোর প্যান্ডেলের হইরই এখন আর নেই। মঝে মাঝে এক আধটা বোমা-পটকা ফাটছে। এই পাড়ার একটা সুবিধে এই যে, পুজোর জন্যে সদর রাস্তা আটকে থাকে না, ঘরবাড়ির ভিড়ের মধ্যেও একফালি ঘেরা মাঠ আছে তেকোনা। সেখানেই পুজো হয়। চুনির মেস থেকে মাঠটা সামান্য তফাতে। কাজেই এই সময় — রাতের হট্টগোল প্রায় নেই।

কার্তিকের হিম আর ঠাণ্ডা অনুভব করা যায় খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে। সামান্য আগে চুনিলালরা ছাদে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া-কুয়াশা মাখা আকাশের চেহারাটা দেখছিল। এখন তারা ঘরের মধ্যে। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ। দশরথ নিচে দোতলায় তার শোবার জায়গায় চলে গিয়েছে। রতিবাবু হয়তো কাল ফিরবেন। তপন নেই।

চুনিলাল বলল, "স্বপ্নের কথাটা তোকে বলেছি। নতুন করে বলার দরকার নেই। তুই তো কুমুদের মুখে শুনলি, যা আমি বলেছিলাম — তা প্রায় সত্যি। একটু আধটু তফাত হতে পারে। তাতে এমন কী যায় আসে! ....তুই এটাকে যা ভাবিস ভাবতে পারিস। ভাবতে পারিস কাকতালীয়, বা ধরে নিতে পারিস বেমক্কা ঘটে গিয়েছে। আমি

কিছুই মনে করব না। কিন্তু তোকে বলছি, ব্যাপারটা আমাকে যত অস্থির করেছিল, কৌতূহল বোধ করেছি— ঠিক ততটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম — কেন এমন হল জানার জন্যে। নিজে ভেবেছি, বইপত্র ঘাঁটার চেষ্টা করেছি। তোকে আগেই বলেছি — আমি ওই সব ফালতু জন্ম-জন্মান্তর মানি না। মানি না বলেই বলেছি — এ রকম অনেক হয়। আমার মতন স্বপ্ন দেখেই হবে তা নয়, একেবারে আচমকাও হতে পারে, হয়তো তুই অফিস যাবার জন্যে তৈরি হয়ে পায়ে জুতোটা গলাচ্ছিস— হঠাৎ কোথ্ থেকে ভেসে আসা মেঘের মতন বা দমকা হাওয়ার মতন তোর চোখের তলায় একটা দৃশ্য ভেসে এল, একেবারেই যা তোর অফিস যাওয়া বাজার করার সঙ্গে রিলেটেড নয়। এরকম ব্যাপার ট্রামে যেতে যেতে বা অফিসে বসে কাজ করতে করতেও হতে পারে। তুই ওটাকে পাত্তা দিলি না। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলি — সেই ঘটনাটাই ঘটে গিয়েছে। যা তুই অনেক আগে আচমকা দেখেছিলি। আমাদের অফিসের ধরিত্রী বোস একদিন কথায় কথায় আমায় বলল, চুনিদা— আমি সেদিন বেহালা যাচ্ছিলাম — খিদিরপুর ব্রিজের কাছে একটা ভিড় দেখলাম, একটা গাড়ি — হঠাৎ আমার মনে হল সেনসাহের অ্যাকসিডেন্ট করেছেন, সিরিয়াস কেস। ....তুই বিশ্বাস করবি, বছর দেড়েকের মাথায় আমাদের সেনসাহেব রেড রোডে বিশ্রী এক অ্যাকসিডেন্ট করলেন। নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। সাহেবকে বাঁচানো গেল না। .... তুই বলবি, এ হল ভুতুড়ে গল্প। বলবি তো!"

"তুই কী বলিস শুনি?"

"আমি কিছুই বলি না। আর যদি বলতেই হয়— তবে কোনও কোনও পণ্ডিতদের কথা মেনে নিতে হয়। পণ্ডিত না বলতে চাস না বলিস, ইন্টারেস্টেড পারসন বলতে পারিস।"

"সেটা কী?"

"সেটা এই যে, আমরা এমন এক জীবন নিয়ে বেঁচে আছি যার বারো আনা মামুলি। বাঁধা গত, বাঁধা বাজনার মতন। এই মামুলি জীবন আমাদের ভেতরের গভীর অনুভূতি ও চৈতন্যকে দিন দিন ভোঁতা করে দিচ্ছে. যদি না দিত তবে হয়ত জীবনের আরও কত রহস্য জানতে পারতাম। অসম্ভব ছিল না। আদিম মানুষের বুদ্ধি আজকের মানুষের মতন ধারালো ছিল না — কিন্তু অনুভূতি ছিল তীব্র, গভীর। ....যাক গে, অন্য কথা বলি। একটা সাধারণ উদাহরণ দিই। তুই আমি যখন অতীতের কথা ভাবি, তখন শালা এই ছোট্ট মগজে এক নিমেষে বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর পিছিয়ে যেতে পারি। কবে শ্যামমাস্টার তুলোধোনা করেছিল আমাদের, কবে কলেজে নীরদস্যার আমাদের ক্লাস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন — সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়। এতগুলো বছর — এই দীর্ঘ সময় — হঠাৎ কেমন যেন গুটিয়ে একটা জীবন্ত মুহূর্ত হয়ে যায়। দ্যাটস্ রিয়ালিটি। স্বপ্ন নয় মতিভ্রম নয়। প্রশ্ন হল, ইফ কনট্রাকশান ইজ পসিবল, হোয়াই নট

এক্সটানশান! অতীত যদি আসতে পারে পলকে — ভবিষ্যৎ নয় কেন?"

জহর হেসে বলল, "হ্যাঁ, সেটা জ্যোতিষী?"

"তুই আমায় ঠাট্টা করছিস?"

"জ্যোতিষীরা তো ভবিষ্যৎ বলে দেয়।"

"আমি তো ভবিষ্যৎ বলার কথা বলিনি। আমি বলেছি, আচমকা একটা ছবি বা ঘটনার ঝিলিক চলে আসে মানুষের মনে যা হয়তো ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলে যায়। এটা নিশ্চয় কমন্ নয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে যেতাম। কখনও কখনও এমন হয়ে যায় — কেন হয়, কেমন করে হয় — তা বলা মুশকিল। হয়তো ইনস্টিংকট, ইনটিউশান, বা সাম সর্ট অফ প্যারানরম্যাল ইমাজিনেশান। তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে এত বছর বাদে — আমি কী ভেবেছিলাম — না স্বপ্নেও আশা করেছিলাম। কিন্তু হয়ে গেল। এটা চান্স ফ্যাক্টর। এর জন্যে আমি ভাই কিস্যু ক্লেইম করিনি। করছি না। কিন্তু কুমুদের বেলায় —!"

"ওটা আমি মেনে নিচ্ছি। তুই কুমুদের কথা বল?"

চুনিলাল বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে বার দুই-তিন পায়চারি করল। জল খেল। তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

"তোর সঙ্গে কুমুদের সম্পর্ক ক' বছর?" জহর জিগ্যেস করল।

"দু'বছরের মতন।"

"ও কী করে? কে কে আছে ওর?"

"ইতিহাস চাই তোর! তা হলে শোন, কুমুদের বাবা ছিল উকিল। পেশায় উকিল হলেও তার কালো উর্দির তলায় যে হাত দুটো ছিল সেই হাত ছিল আরও কালো। কলকাতার পাবলিক থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে তার খাতির ছিল, তাদের হয়ে কাজকর্ম তো করতই — উপরির মধ্যে পার্টি ধরে টাকা হাওলাত করে এনে দেবার ব্যবস্থা করত, নিজের পকেটেও আসত কিছু। থিয়েটারের অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসের সঙ্গেও দহরম মহরম ছিল লোকটার। তাদের হয়েও আইনি কাজ করত। ভদ্রলোকের নাম তারকমোহন মুখুজ্যে। জবরদস্ত বামুন। তা তারকবাবু একটি থিয়েটারের মেয়েকে — বড় কেউ নয় — দ্বিতীয় পক্ষ করে রেখে দিয়েছিল। বিয়ে করে অবশ্য নয়, উপপত্নী করে। কুমুদ হল তারই মেয়ে। তবে কিনা তারকবাবু যতই পাকা ফিকিরবাজ হোক, যে বাড়িতে কুমুদকে দেখেছিস্ — ওই বাড়িটা ওদের কিনে দিয়েছিল। এমনিতেও কুমুদদের ব্যাপারে কোনও অবহেলা করেনি। লেখাপড়াও শেখাতে চেয়েছে কুমুদকে। কিন্তু বিধি বাম। তারক মুখুজ্যে মারা গেল স্ট্রোকে। আদালতেই। ব্যাস্ চ্যাপ্টার শেষ।"

জহর বলল, "প্রথমটা শেষ। পরেরটা?"

"ভেরি অর্ডিনারি। কুমুদের মা থিয়েটার যাত্রা নিয়ে বছর কয়েক কাটাল। তারপর মারা গেল।"

"আর কিছু নেই?"

"আর কিছু বলতে, কুমুদের মা মেয়ের একটা বিয়ে দিয়েছিল। সে-বেটা মাস কয়েক মাত্র ছিল, তারপর চুরিচামারি করে পালিয়ে গেল।"

জহর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কুমুদের চলে কেমন করে। যা দেখলাম তাতে তো মনে হল ভালই আছে। ঠাটবাট একেবারে নষ্ট হয়নি।"

চুনিলাল আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়েই বলল, "চলে যায়। নীচের তলায় বাইরের দিকে দুটো ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। ফণী স্যাকরার ঠুকঠাক চলে দিনের বেলায়। তুই গিয়েছিস রাত্রে! নজর করে দেখিসনি। তারক মুখুজ্যে যতই ধান্দাবাজ হোক মেয়ের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। মায়ের সোনাদানাও আছে হাতে কুমুদের, ওই ছোকরা একেবারে সাফ্ করে দিয়ে পালাতে পারেনি। তাছাড়া কুমুদকে একসময় স্টেজেও দেখা যেত। ছোটোখাটো কাজ, থিয়েটার সিনেমায়। এখন আর নয়। ডাক নেই। ইচ্ছেও নয়।

"আসলটা চেপে যাচ্ছিস!"

"কী?"

"তুই নিজেও টাকাপয়সা ঢালিস ওখানে।"

চুনিলাল অপ্রস্তুত হল না। হেসে বলল, "তুই এত বুদ্ধু হলি কেমন করে! আমি তোকে আগেই বলেছি হস্তিনীকে পালন করতে হয়। ওরে শালা, পালন মানে কি শুধুই মুখ দেখতে যাওয়া! দিতে তো হয়ই। তবে ও চায় না, চায়নি কোনওদিন। আমিই জোর করে দিয়েছি। দিই।"

জহর নিজেও এবার সোফা-কাম-বেডে শুয়ে পড়ল। ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বাইরে আর সাড়াশব্দ নেই। কচিৎ কোনও ডাক যদি না ভেসে আসে দূর থেকে। ঘরের ছাদে ময়লা রং ধরেছে। দেওয়ালের কোণে ঝুল জমেছে।

ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জহর ডাকল, "চুনি!"

"বল।"

"তুই তো কুমুদকে বিয়ে করতে পারিস।"

চুনি পাশ ফিরল না। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "বি-য়ে। কেন?"

"তুই ওকে ভালবাসিস।"

"বাসি। কিন্তু বিয়ে করব কেন?"

"বাঃ! ভালবাসবি, যাবি ওর কাছে --- তবু বিয়ে করবি না?"

"জবাবটা তোকে এভাবে দেওয়া যাবে না।"

'কেন?"

"সে অনেক কথা। তাছাড়া, কুমুদের একটা বিয়ে হয়েছে। সে-বিয়ের ছাড়াছাড়ি হয়নি এখনও। আইন আদালত করতে হবে। অনেক ফ্যাচাং। তারপর ধর একদিন সে বেটা ফিরে এসে আমার পেটে একহাতি ছোরা ঢুকিয়ে দিল। তখন! ....না, আগে দেখি আমার ভালবাসাটা কতটা খাঁটি। তারপর ভেবে দেখব।" হাসল চুনি।

ছয়

কালীপুজোর পালা চুকেছে কবেই, দেওয়ালি ফুরিয়েছে। শীত এসে পড়ল। উত্তরের হাওয়া এখনও অতটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি, তবে দুপুরের পর মাঝে-মাঝেই ঝাপটা আসে।

জহর দুটো চিঠি দিয়েছে ফিরে গিয়ে। নানান কথা। ওরই মধ্যে লিখেছে, জানুয়ারির গোড়ায় বা মাঝামাঝি সে আবার কলকাতায় আসছে। কাজে।

চুনিলাল জবাব দিয়েছে বন্ধুকে। "চলে আয়। আমি আছি।"

চুনিদের মেসে একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটে গেল এর মধ্যে। তপন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা হড়কে একেবারে তিন ধাপ নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। পায়ের পাতার হাড় ভাঙল ওর। প্লাস্টার করে ওকে এখন কাকার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রীরামপুরে। মাস দুয়েকের ধাক্কা। তপনের ঘর ফাঁকা। রতিবাবু ভালই আছেন। ভদ্রলোক আপাতত কলকাতায়, নড়তে পারছেন না।

তপন থাকলে মাঝে মাঝে এই পাড়ার দু'একজন ছোকরা — বন্ধুগোছের তপনের ঘরে বসে আড্ডা জমায়, হইচই করে। সে নেই। মেসবাড়ি সন্ধের দিকে ঝিমিয়ে থাকে।

চুনিলাল আগের মতনই। মেসে থাকলে সন্ধেবেলায় বইটই পড়ে, গান শোনে, একটা ছোট টেলিভিশন আছে তার ঘরে। কদাচিৎ খোলে। মাঝে মাঝে রতিবাবু এসে সন্ধের খবরটা শুনে যান।

সেদিন চুনিলাল কুমুদের বাড়ি গিয়ে শুনল তার জ্বর হয়েছে। নতুন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। গলা ভারী, কাশলে শব্দ হচ্ছে ভাঙা-ভাঙা।

কুমুদ একটা গরম চাদর জড়িয়ে ঘরে এসে বসল।

চুনিলাল বলল, "কত জ্বর?"

"বেশি না। একশো মতন।"

"ওষুধ খেয়েছ?"

"কাশির একটা ওষুধ খেয়েছি। সেরে যাবে। দু'-তিন দিন দেখি।"

"অবহেলা করো না।"

"না।"

অন্য পাঁচটা কথার পর কুমুদ বলল, "মানুমাসি প্রায় যাই-যাই হয়েছিল পরশু দিন। শ্বাস নিতে পারছিল না। রত্না তাদের নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছে মাঝে। ভাল আছে এখন।"

"ভাল থাকলেই ভাল। ....খবর কিছু পেলে?"

কুমুদ মাথা নাড়ল। "না। এ বলে একরকম ও বলে অন্যরকম। ঠিক খবরটা কেউ বলতে পারে না। আর যা বলে তা তো আমি আগেই শুনেছি। মানুমাসিকে আমি নিজেই চিনি। ওরা এ-পাড়ায় অনেক পরে এসেছে। সেই যে বছর মা চলে গেল, সেই বছর। রত্নাকেও জানি ভাল করে। মেয়েটা বরাবরই চুপচাপ, শান্ত। খানিকটা একলা থাকতে ভালবাসে। আমায় কুমুদদি বলে ডাকত।"

চুনিলাল আপাতত কথাটা নিয়ে আর এগুতে চাইল না। পরে একসময় পাকা খবর জানা যাবে নিশ্চয়, তাড়াহুড়োর দরকার কী! তা ছাড়া চুনির নিজের ব্যাপার এটা নয়। আসুক না জহর।

"তোমায় বলেছি নাকি, আমার বন্ধু আবার আসছে। জানুয়ারির গোড়ায়, না হয় মাঝামাঝি —!"

"বলেছ।"

চুনিলাল কী ভেবে হেসে ফেলল। বলল, "আমার আজকাল আর সব কথা মনে থাকে না, ভুলে যাই। মগজ শুকিয়ে যাচ্ছে।"

কুমুদ হাসল। মৃদু হাসি। মুখটা শুকনো, খসখসে। চোখ ঈষৎ ছলছল করছে। গলার স্বর ভাঙা। হাসার সময় দাঁত চোখে পড়ল। ওপর দাঁতের একটার যেন কোণ ভাঙা। বেশ দেখায় হাসলে। দাঁতের গড়নে ও উজ্জ্বলতায় ধারালো ভাব নেই। কুমুদ বলল, "মগজ শুকোবে কেন, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে থাকো আজকাল।"

"আরে না, অন্যমনস্ক হব কেন! আর মাঝে মাঝে সবাই অন্যমনস্ক হয়।"

"আগে তো হতে না। আজকাল দেখি প্রায়ই এটা-ওটা ফেলে যাও। কোনওদিন সিগারেটের প্যাকেট, কোনওদিন রুমাল, কোনওদিন ঘড়ি —।" কুমুদ মজার গলায় বলল।

চুনিলালের মনে পড়ল, আগের দিন হাত থেকে ঘড়িটা খুলে সে নাড়াচাড়া করছিল। করছিল, কারণ হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভেবে ঘড়িটা খুলে দম দিতে গেল। দেখল, দম আছে — তবু বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানে কলকব্জার কোনও গোলমাল। নাড়ল জোরে জোরে। দু'পাঁচ ঘর চলেই আবার বন্ধ। অর্থাৎ গিয়েছে ঘড়িটা, দোকানে দিতে হবে। .....হাতে না পরে ঘড়িটা পাশেই রেখেছিল, যাবার সময় নিয়ে যাবে। তা অবশ্য হয়নি। যাবার সময় ভুলে গিয়েছিল। ফেরার পথে রাস্তায় মনে পড়ল, তাও হয়তো পড়ত না — যদি না সময়টা দেখতে যেত।

চুনিলাল হেসে বলল, "ফেলে যাইনি, ভুলে গিয়েছিলাম। ঘড়িটা আজ নিয়ে যেতাম।"

"যেতে না। মনে থাকত না তোমার। যাদের অনেক ঘড়ি থাকে, তাদের অত চট করে খারাপ ঘড়ির কথা মনে পড়ে না।"

চুনিলালের হাতে আজ অন্য ঘড়ি। হয়তো কুমুদের কথাই ঠিক। আজও হয়তো তার মনে পড়ত না। চুনি মাথা নাড়ল। হাসল। বলল, "কে বলেছে তোমায় আমার অনেক ঘড়ি ? মাত্র তিনটে। তার মধ্যে একটা আমার পাওয়া — মানে উপহার পাওয়া। অফিসের এক জন দিয়েছিল, বাইরের ঘড়ি, কোয়ার্টজ..., দেখতে বাহারি, তবে দামী নয় — শখ মেটানো যায়।"

কুমুদ শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলো। ঝামরানো সর্দির জন্যে জল আসছে। "আজ যাবার সময় দিয়ে দেব।" বলে কী মনে পড়ায় আবার বলল, "তোমার সেই কৌটোটাও পড়ে আছে। অত যত্ন করে রাখলাম। অথচ যখনই খুঁজতে যাই — খুঁজে পাই না। পাব ঠিকই।"

চুনিলাল কথা বলল না। অন্য দিন যেটুকু খায় আজ তার চেয়ে কমই খেয়েছে এখন পর্যন্ত। ভাল লাগছিল না। দুপুর থেকেই একটা অস্বস্তি বুকের তলায় জমে আছে।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কুমুদই বলল, "পরশু দিন আমাদের এদিকে একটা খুন হয়েছে, শুনেছ?"

"খু-ন! না," চুনিলাল তাকাল। "কোথায়?"

"কাছেই। দুটো গলির পর। এক ভদ্রলোককে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে।"

"সে কী! কেন?"

"কেউ বলছে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবুয়াদের রেষারেষি ছিল; কেউ বলছে ভদ্রলোকের হাতে যে ব্যাগ ছিল তাতে নগদ টাকা ছিল অনেক; কারও বা কথা — ভদ্রলোক লুকিয়ে পুলিশের কাছে বাবুয়াদের খবরাখবর দিত। যার যা খুশি বলছে।"

চুনিলাল বলল, "খুনটুন এখন জলভাত। রোজই হয়। পাড়া-বেপাড়া নেই, দিন

দুপুর নেই, হাট বাজার দোকান সর্বত্রই হচ্ছে। একদিন দেখবে আমিও হয়ে গিয়েছি। তোমাদের এই গলিতেই লাশ পড়ে আছে।" বলতে বলতে হেসে উঠল চুনি।

কুমুদ বলল, "দরকার নেই লাশ পড়ার। তোমার সঙ্গে কার শত্রুতা! ব্যাগে ভরে সোনাদানা টাকাও বয়ে অনছ না! কী জন্যে মারবে তোমায়!"

"না মারলেই ভাল!"

অল্প সময় আর কোনও কথা নেই। কুমুদ একবার উঠে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে। বসল। বলল, "এই তোমার ঘড়ি, বলে হাতের মুঠো খুলে ঘড়িটা এগিয়ে দিল সামনে।

চুনিলাল দেখল. ঘড়িটা তুলে নিল না।

কুমুদ আবার কাশল। গলার স্বর ভেঙে যাচ্ছে। সামান্য খসখসে। "ক' দিন কোথাও যেতে ইচ্ছে করে। বাইরে।"

চুনিলাল সিগারেট ধরিয়েছিল। ধোঁয়া টানল। বলল, "বেড়াতে ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় যাবে?"

"তুমিই বলো না। বাইরে থেকে ক' দিন ঘুরে এলে -- শরীরটা ভাল লাগত।"

"কোথায় তোমার ভাল লাগবে! পুরী যাবে?"

"না, দু'বার গিয়েছি।"

"তোমার পক্ষে শুকনো জায়গা ভাল। এই ধরো মধুপুর, শিমুলতলা, যশিডি...."

"দেওঘর। ....আমাদের ফণীবাবুর বাড়ি আছে জামতাড়ায়।"

"তাও যেতে পার। তবে যশিডি মন্দ হবে না। ....আমার মনে হচ্ছে, কে যেন আমায় একবার যশিডিতে একটা বাড়ির কথা বলেছিল। খোঁজ নেব।"

"দেওঘরেও যেতে পারি। ....ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে।"

"দেখি।"

কুমুদ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "তুমি যাবে না?"

চুনিলাল কয়েক মুহূর্ত দেখল কুমুদকে। হাসল, হালকা ভাবেই। "আমার যাওয়া মুশকিল। অফিস ফেলে পালাব কোথায়! তা ছাড়া — আমরা একটা বড় কাজ পেতে পারি। লাখ পনেরো টাকার কাজ। তারাতলার দিকে। কথাবার্তা চলছে। এ সময় যাওয়া যাবে না।"

কুমুদ বলল, "এ সময়ের কথা কে বলছে! শীত পড়ুক। তখন...."

"দেখি— পরের কথা পরে।"

কুমুদ দেখছিল চুনিলালকে। সে জানে, চুনি যাবে না। এর আগেও দু'একবার কথা

উঠেছে, চুনির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে, সে যেন কোথাও বাধা পায়, কুমুদের সঙ্গে ওইভাবে একত্রে থাকতে চায় না।

কিছু বলল না কুমুদ। মুখ নিচু করে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকল।

গ্লাসের বাকিটুক শেষ করল চুনিলাল। গ্লাসটা রাখতে গিয়ে ঘড়িটা নজরে পড়ল। রেখে দিয়েছে কুমুদ গদির ওপরেই। বন্ধ ঘড়ি।

হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিল চুনি। দেখল। এই ঘড়িটা থেমে গিয়েছে ক'দিন আগেই, সময়কে নিজের মধ্যে থামিয়ে দিয়েছে। বাইরের সময়কে সে ধরতে পারছে না, মুহূর্তগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, বয়ে চলেছে সময়। শুধু ওই বন্ধ ঘড়িটা নিজের সীমার মধ্যে কাঁটা দুটোকে থামিয়ে দিয়েছে।

চুনিলাল ঘড়িটা পকেটে রেখে দিল। বলল, "তুমি কখন যাবে বললে, শীত পড়লে! পৌষ মাসে, না, মাঘ মাসে? ডিসেম্বরের মাঝামাঝিও যেতে পার। ভাল শীত চলবে তখন।"

"আগে ব্যবস্থা হোক, তারপর—"

"হয়ে যাবে।"

"যাব তাহলে!"

"আমি দেখছি। যশিডি দেওঘর দু'জায়গাতেই দেখছি।"

কুমুদ চুপ করেই থাকল।

রাত্রে শোওয়ার আগে একটা বই বা কাগজ টেনে নিয়ে পাতা ওলটানো চুনিলালের অভ্যেস। ক্লান্ত চোখে ঘুম আসে তাড়াতাড়ি। মাঝে একবার তার ঘুম আসত না ঠিকমতন। আসত, ভেঙে যেত। আবার মাঝামাঝি রাতে ঘুম ভেঙে জেগেও থাকত। শরীর খারাপ লাগত সকালে। দিন পনেরো ওষুধও খেয়েছিল ঘুমের। এখন অবশ্য সেসব অসুবিধে নেই। তবু আজ বই নিয়ে শুয়েও তার চোখ ক্লান্ত হল না। বই রেখে দিল। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম আসছিল না। মায়ের কথা মনে এল প্রথমে। আজ নয়, গত কাল মায়ের চিঠি এসেছে কাশী থেকে। সাধারণ চিঠি, মা যেমন লেখে। আলাদাভাবে আরও একটা চিঠি এসেছে আশ্রমের অফিস থেকে। সরাসরি যে অফিস থেকে লেখা তা নয়, তবে যারা অফিস দেখাশোনা করে তাদের একজন নির্মলা লিখেছেন, শরীর ভাল নেই মায়ের। হাত-পা ফুলে যাচ্ছে, জ্বর হচ্ছে মাঝে মাঝে। মা অবশ্য একবারও নিজের শরীরের কথা লেখেনি। চুনিলাল যে একবার যাবে মাকে দেখতে — মা লিখবে না। এক-এক জন মানুষ থাকে সংসারে যাদের অদ্ভুত এক অহমিকাবোধ আছে। অকারণ সেই 'আমি' নিয়ে ভোগে। মা অনেকটা সেই রকম। চুনিলাল এমন কথা কখনওই বলবে না যে

তার মা স্বভাবে ভীষণ স্বার্থপর, নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্য বিষয়ে নিস্পৃহ ছিল, উদাসীন থাকত, কিংবা মা নিষ্ঠুর রুক্ষ ছিল। না, তা নয়। কিন্তু মা বরাবরই বড় বেশি আত্মসচেতন ছিল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। অহঙ্কারী বললেও বলা যায়। বাবা সে তুলনায় সাদামাটা মানুষ ছিল, মাঝারি মাস্টার, ভাল কথায় অধ্যাপক, খানিকটা পড়ুয়া জাতের, রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেও অন্য পাঁচটা কৌতূহল তার ছিল। যেমন, বাবা এক দিকে যেমন মনে করত নিউটন দু'-চার শো বছরের ভাবনাকে একাই অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে — যা আজ আর তেমন করে আমাদের চমকে দেয় না, তেমনই বাবার ধারণা ছিল প্রাচনীকালের পণ্ডিত কনফুসিয়াসের চেয়ে নীতিবাদী ও প্রাজ্ঞ মানুষ কমই জন্মেছে সভ্যতার ইতিহাসে। বাবা গৌতম বুদ্ধেরও ভীষণ ভক্ত ছিল। কলেজ, বই ঘাঁটা, জনাকয়েক বন্ধু, আর মাঝে মাঝে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সস্ত্রীক ঘোরাফেরা ছাড়া বাবার জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। মা বোধ হয় বাবাকে চিনে নিয়েছিল ভালভাবেই, স্বামীকে নিজের মতন থাকতে দিত, অশান্তি করত না, তাদের বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাটিও ছিল না, বরং মায়ের যা পছন্দ হত না — তা নিয়ে চেঁচামেচিও করত না, শুধু মুখ ঘুরিয়ে নিত। তবে মায়ের জেদ, দৃঢ়তা, নিজের মতামত ছিল বেশ শক্ত, টলানো যেত না।

বাবা মারা গেল। বয়েস যে বেশি হয়েছিল তাও বলা যাবে না। সাতষট্টি আটষট্টি। মা যে কী ধরনের আঘাত পেয়েছিল ওপর ওপর বোঝা যায়নি। মাকে বোঝা কত শক্ত চুনিলাল তখন বুঝতে পেরেছে। বাইরে বাইরে মনে হত, সংসারে যা স্বাভাবিক মা তা মেনে নিয়েছে, কোনও অভিযোগ হা-হুতাশ করেনি। তার বছর দুই-তিনের মধ্যে মা কাশী চলে গেল 'দীনমণি-মায়ের আশ্রমে'। দীনমণিমাকে লোকে মাতাজি বলে। চুনি সেখানে কোনওদিন যায়নি। মা একেবারেই চায়নি ছেলে গিয়ে মাকে দেখে আসুক। "আমাকে আমার মতন থাকতে দাও, অশান্তি করো না—' এই হল মায়ের মনের কথা। চুনি সেটা বোঝে। বোঝে বলেই মায়ের শান্তিতে নাক গলাতে চায়নি। মায়ের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক — দূরত্বের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেভাবে দূরত্ব কেন হবে! ছেলেবেলা থেকেই চুনি মায়ের স্নেহ যত্ন পেয়েছে যা সকলেই পায়। কিন্তু আতিশয্য দেখেনি মায়ের। কখনও কখনও মায়ের সঙ্গে তার মজার ঝগড়াও হত। মা খানিকটা মজা হাসি তামাশার পর হঠাৎ থেমে যেত। আর এগুতো না। উঠে চলে যেত। চুনিলালের বেশ মনে পড়ে, সে যখন ষোলো-সতেরো বছরের তখন তাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একটি মেয়ে পাপিয়ার সঙ্গে তার ভাবসাব হয়েছিল খুব। দু'একটা টুকরো চিঠি লেখালিখিও চলছিল। মা জানতে পারল। জানার পর একদিন মা ছেলেকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে অবাক এক কাণ্ড করল। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে চেপে ধরে দু'গালে চুমু খেল বার কয়েক, কী তীব্র, কী যে স্বাদ সে চুমুর, কত যে আনন্দ শিহরন

তারপর খুব নিচু গলায় বলল, ওই মেয়েটা কি তোর কাছে বড়, না, আমি?....চুনি মাথা নেড়ে বারবার বলেছিল, না না, তুমি।

মা তার এক সম্পর্কের বোনঝি— মানে চুনির রমলাদিদিকেও ভালবাসত। হয়তো ছেলের মতন নয়। কিন্তু বাসত যথেষ্টই। দিদির মধ্যে তেজী ভাব ছিল। চুনির সঙ্গে রমলাদিদির রেষারেষি ছিল না, তবে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলত না। মা এসব ব্যাপারে মাথা গলাত কমই। দিদির বিয়ে হয়ে গেল। বছর কুড়ি-একুশ বয়েসে। চলে গেল দিল্লি। সেখান থেকে বাইরে। যোগাযোগ ছিল সামান্য। আর নেই। কেননা দিদি মারা গিয়েছে।

মায়ের শরীর খারাপের খবরে চুনিলালের শান্তি হচ্ছিল না। হাত পা মুখ ফোলা হয়তো মারাত্মক কোনও অসুখ নয়। অ্যানিমিয়া গোছের কিছু হতে পারে। বা অন্য কোনও ব্যাধি। তেমন বড় কিছু হলে কি মা জানাবে না? মা না জানালেও আশ্রম থেকে জানাবে নিশ্চয়।

ঠিক এই মুহূর্তে চুনিলাল মাকে দেখতে কাশী যেতে পারে না। তাতে মা অখুশি হবে। বরং একটা চিঠিই লিখবে সে, মাকে। আশ্রমের দীনমণিমাকে। অফিসের নির্মলাকেও লিখতে পারে। কিন্তু চুনিলাল এদের কাউকেই চেনে না। চোখেও দেখেনি। সে কাশীতে মায়ের কাছে যায়নি কখনও।

দরকার পড়লে যেতেই হবে। এমন কি যদি দেখে মায়ের অসুখ জটিল দেখে তবে তাকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে আসবে। মাকে সে নিজের খেয়ালে চলে যেতে দিতে পারে না।

সাত

"আরে, তুই!"

"চিঠি পাসনি?" জহর বলল।

"কোন চিঠি? আগের?"

"আরে না, দু'একদিন আগে দিয়েছি; টেনথ।"

"না। আজকাল পোস্ট অফিস মানে ঘোস্ট অফিস। লেটার লস্ট। তাতে আর কী হল— তোর তো আসার কথাই ছিল। কখন এসেছিস?"

"সকালের গাড়িতে। তোর মেসে এসে দেখি তোরা অফিস চলে গিয়েছিস। তাতে অবশ্য আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। দশরথ আছে...."

চুনিলাল গায়ের পুলওভার খুলতে খুলতে বলল, "তপনের কথা শুনেছিস!"

"শুনলাম।"

"ভালই আছে। প্লাস্টার কেটে দিয়েছে। হাঁটছে। আসছে হপ্তায় এসে পড়বে। রতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"এই তো ফিরলেন। দেখা হয়েছে।"

"তোর বাড়ির খবর ভাল?"

"মোটামুটি —!"

"দাঁড়া, এগুলো পাল্টে নিই। নিয়ে বাথরুম সেরে আসি।"

প্যান্ট জামা খুলে চুনিলাল ঘরের পোশাক পরল। বাথরুমে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে। হাত মুখ মুছল পরিষ্কার করে। মাথার চুল আঁচড়ে নিল আলগাভাবে। গায়ে চাদর জড়ালো।

চা নিয়ে এল দশরথ। কিছু খাবার, দোকান থেকে আনা।

"নে, চা খা—! তুই এসে ভালই হল। আমি অবশ্য তোকে এক্সপেক্ট করছিলাম।"

"আসব যে তুই জানতিস। এবারে একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি। একটা গুজরাটি ফার্ম আমায় ক'টা মাল গছিয়েছিল। স্পেয়ার পার্টস। বলল, ভাল হবে, ডিপেন্ডেবল, দামেও খানিকটা সস্তা। চালিয়ে দেখুন বাজারে। নিলাম। ওখানে চালাতে গিয়ে দেখলাম, আমার কাজ হল না, অকারণ খাটুনি, পয়সা নষ্ট। কাস্টমার হাতছাড়া হয়ে যায় আর কী!" জহর তার ভোগান্তির বিবরণ শোনাল খানিক।

চুনিলাল শুনল। সে অতশত বুঝল না। আগ্রহও নেই তার। তবু শুনল।

অল্প সময় চুপচাপ থাকল দু'জনেই।

শেষে জহর বলল, "তোর কুমুদের খবর কী?"

"কলকাতায় নেই।" বলে হাসল, "জল হাওয়া বদলাতে গিয়েছে জামতাড়া।"

"জামতাড়া! জামতাড়া কেন?"

"একটা বাড়ি পেয়ে গেল। কুমুদদের নিচে ফণীবাবুর গয়নার কারখানা, ভদ্রলোকের একটা বাড়ি আছে ছোটখাটো। এখন ফাঁকা। উনি বললেন। পরে আর ফাঁকা নাও থাকতে পারে। চলে গেল। দিন দশ-পনেরোর জন্যে গিয়েছে। ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে।"

জহর কী মনে করে হাসল। "তোরও তবে এখন ফাঁকা যাচ্ছে!"

"কেন! আমি কি রোজই কুমুদের কাছে যাই! তুই শালা আমায় ভাবিস কী! কুমুদ কি আমার রক্ষিতা?"

জহর হালকাভাবেই বলল, "রাগছিস কেন!"

"রাগছি না, বলছি। ....তুই বেটা কিস্যু বুঝবি না। তোর হাতুড়ি-ঠোকা মাথা।"

জহর হাসতে লাগল।

"হাসিস না! জীবনে সব জিনিস হাটে-মাঠে পাওয়া যায় না, বিক্রিও হয় না বাজারে। কুমুদ আমার স্বপ্নে পাওয়া জিনিস....স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি রেখেছি হৃদয়ে যতনে....., শুনেছিস গানটা।"

জহর মজা করেই বলল, "তা তোর জিনিস তোর কাছেই থাক, কেউ তো কেড়ে নিচ্ছে না।"

চুনিলাল চুপ করে থাকল।

চা খাওয়া শেষ হল। দশরথ এল একবার। চায়ের পাত্রগুলো নিয়ে চলে গেল. দোতলা থেকে রতিবাবু তাকে ডাকছেন।

সিগারেট ধরাল চুনিলাল। "খাবি?"

"না; থাক।"

"ভাল কথা, তোর সেই ভদ্রলোক — প্রবোধদার কী হল? মানময়ীর জবাব শুনে কী বলল রে?"

জহর পা তুলে বসল। কলকাতায় শীত পড়েছে। তাদের ওখানে যেমন পড়ে — পড়েছে— তার সঙ্গে তুলনা করা বৃথা। ওদিকে এখন কনকনে ঠাণ্ডা। হু-হু হাওয়া দিচ্ছে উত্তরের। গাছের পাতা খসে যাচ্ছে অনবরত। রাত্রে এক-একদিন এমন হিম পড়ে যেন বৃষ্টি পড়ে ভিজে যাচ্ছে মাটি, ঘাস, গাছপালা।

জহর বলল, "প্রবোধদা জবাব শুনে প্রথমে কিছু বলতে চাননি। আমি চেপে ধরলাম। তখন যা বললেন তাতে বুঝলাম মানময়ী ওঁর আত্মীয়া। উনি কিছু টাকাপয়সা দিতে চেয়েছিলেন মহিলাকে।"

"রত্নার বিয়ে বাবদ? তাই না?"

জহর অবাক হল। "তুই কেমন করে জানলি?"

"কুমুদ। এমন গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছিলাম যে হাঁড়ির খবর বা[illegible] তোমার প্রবোধদাটি পাকা মাল। মানময়ীকে ভাগিয়ে এনেছিল বহর[illegible] চুনিলাল বলল। "মানময়ীর একটি গাধা টাইপের স্বামী ছিল। প্রবোধ হচ্ছে একটু দূর সম্পর্কে মানময়ীর দাদা। দাদাটি মানময়ীকে লোভ-টোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বার করে আনে। একেবারে সিনেমার গল্প। তফাত শুধু এই — কলকাতায় আনবার আগে দুটি মিলে স্বামী-স্ত্রী হয়ে চা-বাগানে কাটিয়েছে। সেখানে কী একটা হয়, ওরা পালিয়ে আসে কলকাতা। ওই মেয়ে তোমার প্রবোধদার।"

জহর কেমন চমক খেল। "মেয়ে! আমায় যে বলল, ভাগ্নি।"

"মিথ্যে বলেছে। নিজের মেয়েকে শুধু বোনের মেয়ে বলে চালাতে চেয়েছে। অবশ্য এক দিক থেকে রত্না তো ভাগ্নিও হতে পারে।"

"এটা কেচ্ছা, না, সত্যি?"

"সত্যি। ...মানময়ী একটা সময় — তার দাদাটি পালিয়ে যাবার পর কচি মেয়ে নিয়ে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটেও ছিল। যুবতী বয়েসের সুবিধে অনেক। খাওয়াপরাটা চলে গিয়েছে ভালভাবেই। কে যেন ওকে এক সময় ওই গলিতে এনে বসিয়ে দেয়। তা সে যাই হোক রত্না মেয়েটি ভাল। কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বিদ্যেবুদ্ধির যা দৌড় — তাতে আর বেশি এগুতে পারবে না। মানময়ীও আর কতদিন বাঁচবে কে জানে! রত্নার একটা বিয়ে হয়ে গেলে — বুড়ি বেঁচে যায়।"

জহর গম্ভীর হয়ে গেল। কথা বলল না অনেকক্ষণ। শেষে ক্ষোভের সঙ্গে বললে, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রবোধদাকে কম দিন দেখছি না আমরা। মানুষটি ভাল বলেই জানি। এইরকম এক কেচ্ছা তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে — ভাবতে পারি না।"

চুনিলাল বিছানা ছেড়ে উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে কিছু খুঁজল যেন। "যা বাবা, নেইল কাটারটা কোথায় ফেললাম! ....তুই কি বললি? বললি — ভাবতেই পারিস না। বেশ তো ভাবিস না! ভাবলে তোর মনে হতে পারে তোদের প্রবোধদার ভদ্র মুখে বুঝি কালো কালির পোচ মাখানো হল! ভাবিস না।"

জহর বলল, "তুই নিজে মানময়ীকে দেখেছিস?"

"না। ....আমার ভাই দরকার হয়নি দেখার। তবে রত্নাকে দু'-একবার গলিতে দেখতে পারি। তখন অবশ্য জানতাম না, ও রত্না। পরে বুঝলাম। কুমুদ বলার পর।"

"কুমুদ এত খবর পেল কেমন করে?"

"ওকেই জিগ্যেস করিস। ফেরার সময় তো হয়ে গিয়েছে কুমুদিনীর" — বলে চুনিলাল হাসতে লাগল। তারপর বলল, "তুই নিজেও একদিন মানময়ীর বাড়ি চলে যেতে পারিস, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলে জেনে নিতে পারিস!"

"না। আমার দরকার নেই। কী লাভ আমার জেনে!"

নেল কাটার খুঁজে পেল চুনিলাল। ডান হাতের একটা আঙুলের নখ একপাশে উঠে গিয়ে খচখচ করছিল। নখটাকে কেটে সমান করে নিতে নিতে বলল, "তোদের নিয়ে চলে না, জহর। মানুষ একটু-আধটু পাপকর্ম না করলে সে বুঝবে কেমন করে পুণ্যকর্মটা কী! পাপ করলে মন যখন বোঝে কুকর্ম করেছি, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে — তখন যে অনুতাপ হয়...."

"তোর ওই বুলি থামা!"

চুনিলাল বন্ধুর বিরক্তি দেখে হেসে উঠল। বলল, "খেপে যাচ্ছিস কেন ....আচ্ছা— এবার তোকে অন্য যুক্তি দেখাচ্ছি। এতক্ষণ তুই তোর প্রবোধদার পাপকর্মের কথা ভাবলি। এবার একটু উলটো দিক থেকে ভাব। এমনও তো হতে পারে

মানময়ী নিজেই প্রবোধচন্দ্রকে নিজের ব্যাপারে লোভ দেখাত। একেবারে অসম্ভব নয়। শ'য়ে শ'য়ে এমন হয়। হাবাগোবা এক স্বামী, মাথামোটা, বুদ্ধু, অপদার্থ — তাকে যদি ভাল না লাগে মানময়ীর, তা হলে বলার কী আছে! হতেও পারে মহিলা, তখন সদ্য যুবতী, হাতের কাছে নাগালের মধ্যে সব চেয়ে নিরাপদ মানুষটিকে পেয়ে গিয়েছিল — প্রবোধ। দাদা বলে কথা— রাস্তার লোক তো নয়, তাকে নিয়ে ঘরেদোরে শুয়ে-বসে গায়ে গা ঘেঁষলে কার কী বলার আছে! চোখেও লাগে না, লাগলেও কম লাগে। ধরে নে মানময়ীই প্রবোধকে উসকে দিয়েছিল। শোন, তেল আর সলতে থাকলেই প্রদীপ জ্বলে না, একটু আগুন দরকার।"

"তাতে কী হল?"

"তোর প্রবোধদার পাপের মাত্রাটা কমে গেল। এমন কি জিরোও হয়ে যেতে পারে। তখন তোর মনে হবে, বেচারি ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।"

"প্রবোধদাকে ফাঁদে ফেলে মানময়ীর লাভ?"

"মানময়ীরই লাভ বেশি, যদি এটা সত্যি হয়। সে চাইছিল বাঁধা বিরক্তিকর ঘেন্নার সীমানা থেকে কোনও রকমে বাইরে বেরিয়ে আসা। নিজের স্বাধীনতা খুঁজছিল।"

"তাতে লাভ হল কী?"

"হল না। অঙ্কের খানিকটা সে মেলাতে পারল — বাকিটা পারল না, হয়তো নিজের দোষে....। অনেক সময় আমরা ভাবি, একটা গণ্ডি পেরোলেই আমার মুক্তি। আসলে তা নয়। সামনেরটা পেরোলাম তো আবার এক গণ্ডির মধ্যে আটকে গেলাম। সেটার পর আবার। কোথায় থামব? জীবনে হিসেব মেলানো বড় কঠিন।"

জহর কথা বলল না। বোধ হয় সে চুনিলালের কথা ও যুক্তি মেনে নিতে রাজি হল না।

জানলা বন্ধ। দরজাও পুরোপুরি খোলা নয়। শীত বাড়ছে। হাল মরসুমে কলকাতায় পৌষের গোড়ায় শীত পড়েনি ভাল। ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলো মেঘলায় কেটেছে। মনে হত বৃষ্টি হতে পারে। দু-এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হয়েছে। শীত পড়ল তার পর মাঘের মুখে – জানুয়ারিতে। গত সপ্তাহখানেক বেশ শীত। কাগজওয়ালাদের কথায় 'কোল্ড ওয়েভ' চলছে সর্বত্র।

রতিবাবু এসেছিলেন ওপরে। খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে গেলেন। ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়েন খুঁটিয়ে। কোথায় কেমন ডামাডোল চলছে, দিল্লির হালচাল কেমন, কোন নেতার খামারবাড়িতে হানা দেওয়া হয়েছিল — এই সব ছোটখাটো খবর থেকে আমেরিকা চিনের খবরও। সময় কাটাবার উপযুক্ত সঙ্গী ভদ্রলোক।

চুনিলাল তার স্বভাব মতন অল্পস্বল্প পানপর্ব সেরে নিচ্ছিল গল্প করতে করতে। রতিবাবুর চা-পান ছাড়া অন্য নেশা নেই। জরদা খান. হালে আবার শখ করে খইনিও ধরেছেন। বলেন পান-জরদা ছেড়ে খইনিটাই ধরে রাখবেন। পয়সা বাঁচে। পানের যা দাম আজকাল!

রতিবাবু চলে যাবার পর চুনিলালরা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল।

জহর কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুনিলাল বলল, "আমাকে একবার বেনারস যেতে হবে।"

"কেন? মাকে দেখতে যাবি?"

"তোকে কি আমি মায়ের কথা লিখেছিলাম চিঠিতে?"

"লিখেছিলি মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, খবর পেয়েছিস।"

"হ্যাঁ। মা নিজে জানায় না, তবে আমি খবর পাই। আমার মনে হচ্ছে মায়ের হার্টের গোলমাল হচ্ছে। কিডনিরও হতে পারে। তবে যা বুঝতে পারছি — আন্দাজে — তাতে হার্টের ব্যাপারেই সন্দেহ হচ্ছে। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি।"

"নতুন কোনও খবর পেয়েছিস?"

"আগে একটা পেয়েছিলাম আর সেদিন একটা পেয়েছি।"

"তা হলে চলে যা। দেখে আয়।"

"যাব। এই মাসেই যেতে পারি।"

জহর পায়ের দিকে রাখা কম্বলটা খুলে কোমর পর্যন্ত টেনে নিল। "কিন্তু কী হয়েছে জানতে হলে তোকে তো কলকাতায় আনতে হবে মাকে। ডাক্তার ওখানেও পাবি। তুই কি ভরসা করতে পারবি তাদের ওপর? কলকাতায় তোর জানাশোনা অনেক।"

"আমি তাই ভেবেছি। কলকাতায় এনে ভাল করে দেখাব। পবিত্রর একটা ফ্ল্যাট আছে বাগবাজারে। ফাঁকা। সেখানে মাকে রেখে চেক আপ করিয়ে নেবার ইচ্ছে। অন্য অসুবিধে তেমন হবে না, একমাত্র ঝামেলা মা আসতে চাইবে কি না!"

"জোর করে ধারে আনবি।"

"ওইটেই চলে না রে ভাই। আমার মাকে দিয়ে জোর করে কিছু করানো যায় না। মহিলা নিজের মরজিতে চলে। না বললে হ্যাঁ করানো যাবে না।"

জহর বলল, "তুই আগে থেকেই ঘাবড়ে যাচ্ছিস!"

"তা যাচ্ছি। ...তোর মায়ের ধাত কেমন?"

"ওসব ট্রাবল নেই। আমরা যা বলব মা তাতেই রাজি। জেদটেদ নেই। মায়ের একমাত্র কষ্ট বোনটার জন্যে। এভাবে হুট করে জিতেন মারা যাবে কে জানত! বিয়ের তিন বছরের মধ্যে চলে গেল। কী যে হয়েছিল তাও বোঝা গেল না। দিন দুয়েকের

হাই ফিভার, অজ্ঞানের মতন হয়ে পড়ে থাকল। তারপরই শেষ।

চুনিলাল আগেই শুনেছে জিতেন — মানে জহরের ভগ্নিপতির কথা। ছেলেটি হঠাৎ মারা গিয়েছে। কোলিয়ারিতে কাজ করত। বছর তিনেকের দাম্পত্য জীবন। অশান্তি ছিল না। সন্তানাদি হয়নি ওদের। হতে পারত, ব্যস্ততা ছিল না ওদের। এক দিক থেকে বেঁচে গিয়েছে জহররা। বোনের সন্তানাদি থাকলে তাকে মানুষ করার দায় ছিল। আবার অন্য দিক দিয়ে ভাবলে জহরদের মনে হয়, ছেলেমেয়ে একটা থাকলে বোনের সান্ত্বনা থাকত। ....জহরের বোন অবশ্য একেবারে ফাঁকা হাতে বসে নেই, ওখানকারই একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। টিচার।

ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখার দরকার হল না। দশরথ এসে জানতে চাইল, খেতে দেবার ব্যবস্থা করবে কি না!

চুনিলাল বলল, ''ক'টা বেজেছে! আর একটু পরে দে।''

সোয়া নয় কি সাড়ে নয় হতে পারে। শীতের রাত। আশপাশ শান্ত হয়ে আসছে। রতিবাবু তাঁর ঘরে শুয়ে শুয়ে রেডিয়ো শুনছেন। শব্দ ভেসে আসছিল।

''তুই ক'দিন আছিস?'' চুনিলাল বলল।

''দিন তিনেক।''

''কাল একবার কুমুদের খোঁজ নিতে যাব। ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। হয়তো এসেও গিয়েছে। জানি না। যাব কাল। যাবি?''

''আমি!''

''কেন! যেতে আটকাচ্ছে কেন তোর? ....সন্ধেবেলায় তোর অন্য কাজ কী আছে?''

''কাজ নেই। তবে আমি গিয়ে কী করব! তুই যাবি তোর কুমুদেব কাছে, মাঝখানে আমি গিয়ে তোদের —''

''রসভঙ্গ! না রে শালা, রসভঙ্গ হবে না। ...তোর কি ভয় করে নাকি?''

জহর হাসল। মাথা নাড়ল। ''না ভয় কিসের! তুই তো আছিস?''

চুনিলাল হেসে উঠল।

আট

কুমুদ ফিরে এসেছিল।

দশ-পনেরোটা দিন বাইরে কাটিয়ে এসে তাকে খানিকটা সতেজ চনমনে দেখাচ্ছিল।

চুনিলাল ঠাট্টা করে বলল, "বাঃ, তোমার শোভা যে বেড়ে গিয়েছে, কুমুদিনী। ভালই ছিলে মনে হচ্ছে!"

কুমুদ যত্ন করে জহরদের বসাল। বলল, "তা ছিলাম। কেন চিঠি পাওনি! আরও ক'দিন থাকলে হত।"

চুনিলাল বলল, "থাকলে না কেন? আমার জন্যে?" বলে হাসল।

কুমুদ সামান্য অপ্রস্তুত হল। বলল, "উপায় ছিল না। বাড়িতে ওদের অন্য লোক যাবে। কথাই ছিল। চলে এলাম।"

"ভালই করেছ। আমার কেমন মন খারাপ লাগছিল।"

হেসে ফেলল কুমুদ। চাপা হাসি। জহরকে বলল, "আপনি কবে এসেছেন?"

"কাল।"

"কাজ নিয়ে?"

"মিস্ত্রিগিরি করে খেতে হয়, কাজ না করলে চলে?"

"আপনাদের খবর ভাল সব?"

"হ্যাঁ চলছে। ....আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, বাইরে গিয়ে উপকার হয়েছে।"

চুনিলাল জহরকে বলল, "তুই ওকে আপনি আপনি করছিস কী! ও বয়সে অনেক ছোট। আপনি বলে খাতির করার দরকার নেই।"

কুমুদ মাথা হেলিয়ে বলল, "সত্যি, আমাকে আবার আপনি কেন! তুমি বলবেন। আপনি বললে আমার নিজের কানেই লাগে।"

জহর হাসার মতন করে বলল, "দেখি। রপ্ত করতে সময় লাগবে।"

"বসুন একটু, আসছি।"কুমুদ উঠে বাইরে চলে গেল।

জহর গলার মাফলারটা জড়িয়ে নিল। বাইরে থাকার দরুনই হয়তো একটা মোটা মাফলার গলায় জড়ানো তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে শীতকালে। নিজেদের জায়গায় থাকলে রাত্রে উলের টুপি না পরে বেরোয় না বাইরে। ওদিকে এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কলকাতায় অবশ্য টুপি পরেনি।

চুনিলাল বলল, "সিগারেট খাবি? একটু গা গরম করে নে....।"

"খাই না তো! দে একটা খাই।"

সিগারেট ধরিয়ে জহর ঘরের চারপাশে এলোমেলো চোখে দেখছিল। এ বাড়ি যে

কত পুরনো এই ঘরে বসেও বোঝা যায়। কড়িবরগা দেওয়া ছাদ। দেওয়ালগুলো চওড়া, জানলায় শিকের গরাদ। মোটা করে রং লাগানো দেওয়ালে। সেই রং হালকা হয়ে এসেছে, কোথাও কোথাও বিবর্ণ। গত দু-চার বছরের মধ্যে অন্তত হাত পড়েনি ঘরে। হঠাৎ পুরনো কালের বক্স গ্রামোফোনটার দিকে চোখ গেল জহরের। হাত তুলে আঙুল দিয়ে গ্রামোফোনটা দেখাল জহর। "ওটা এখনও বাজে?"

"আগে বাজত দেখেছি। এখন বলতে পারব না।"

"আজকাল এসব জিনিস আর চট করে নজরে পড়ে না।"

"পুরা সামগ্রী —!" চুনিলাল হাসল। "কুমুদের মায়ের দু-একটা রেকর্ড আছে।"

"তাই নাকি ! গান গাইতে পারতেন?"

"তখনকার দিনে পাবলিক থিয়েটারে ছিল, একটু আধটু নাচগান দরকার হত। আমি পুরনো রেকর্ডে একটা গান শুনেছি। গানের কথাই বোঝা যায় না। ঘসঘস করে।"

"তবু রেকর্ড!"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। একটি ছেলে এসে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরটা। ছোকরার পরনে কালচে প্যান্ট, গায়ে সোয়েটারের ওপর চাদর জড়ানো। ঘাড় পর্যন্ত চুল। হাড়-ওঠা মুখ। মাথায় হোমগার্ড-মার্কা টুপি।

"কুমুদদি?"

"ভেতরে।"

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে কুমুদকে ডাকতে লাগল। পাশের ঘরের দিকে চলে গেল বোধ হয়।

জহর চুনিলালের দিকে তাকাল। "কে ?"

চুনিলাল বলল, "পাড়ার ছেলে। দেখেছি।"

"কী করে?"

"জানি না। তবে ছেলেটাকে এই রুটের মিনিবাসে দেখেছি বার দুয়েক। টিকিট কাটছিল।"

"তা হলে করে কিছু।"

"তার কোনও মানে নেই। হয়তো খোঁজ নিলে দেখবি স্টপ্-গ্যাপ গোছের কাজ। লোক ছিল না, করেছে। কখনও হাতে কাজ পেলে করে, না পেলে বেকার।"

ছেলেটা কুমুদকে পেয়ে গিয়েছিল। গলা শোনা গেল বাইরে, কুমুদের। সামান্য পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, নেমে গেল ছেলেটা।

কুমুদ ঘরে এল। হাসি-হাসি মুখ, গায়ে ঘন করে গরম চাদর জড়ানো।

চুনিলাল বলল, "কে ?"

"নিমাই।" কুমুদ বলল, "চেনো না?"

"দেখেছি। কী বলে?"

"একটা দরকারে এসেছিল।" বলে দু'মুহূর্ত থেমে হাসল একটু, "ভাল খবর শুনিয়ে গেল। বিয়ে করছে।"

"ছেলেটা মিনি বাসে ছিল না? কন্ডাক্টারি করত ?"

"এখনও করে। সিঁথি রুটের। মিনিবাসের ড্রাইভার হবার ইচ্ছে, আদাজল খেয়ে লেগে আছে। ড্রাইভারের তোয়াজ করলে তবে না হ্যান্ডেল ছাড়বে!"

চুনিলাল হঠাৎ হেসে বলল, "তা ঠিক। তোয়াজই আসল।"বলে চোখ টিপলো যেন।

হেসে উঠল তিনজনেই।

বেশি রাত করার ইচ্ছে জহরের ছিল না। চুনিলালেরও নয়। শীত যেন বেড়েই চলেছে। সাড়ে আট বাজার আগেই চুনিলাল ওঠার জন্যে তৈরি। তার শরীরটাও ভাল লাগছিল না, পিঠের দিকে একটা ব্যথা হয়েছে। হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, না হয় খিঁচ লেগেছে আচমকা। দুপুরে একবার জ্বর জ্বর লাগছিল।

উঠেই পড়তে যাচ্ছিল চুনিলাল, হঠাৎ কুমুদের কী মনে পড়ে গেল। বলল, "ওহো, তোমার সেই জিনিসটা পেয়েছি। বাইরে যাবার আগে বাক্স গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, শীতের পুরনো জামা শাল বেছেবুছে নিচ্ছি হঠাৎ তোরঙ্গর তলায় এক কোণ থেকে কৌটোটা পেয়ে গেলাম। বাবা, বাঁচলাম। দাঁড়াও একটু এনে দিচ্ছি। আমার কাছে আর রেখো না। যা ভুলো মন আবার কোথায় হারিয়ে ফেলব!"

চুনিলাল বলতে যাচ্ছিল, এখন থাক, পরে নেব। কিন্তু তার আগেই উঠে পড়েছে কুমুদ।

"অত ব্যস্ত হবার কী আছে?"

"না, তুমি নিয়ে যাও।"

"দু-তিন দিন পরে আবার যখন আসব তখন দিও।"

"দু দণ্ড দাঁড়াও না; এনে দিই।"

কুমুদ অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

জহর উঠে দাঁড়িয়েছিল। চুনিলালও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘরের বাতিটার তলায় কাচের শেডের কালচে ছায়া জমে আছে। জানলা বন্ধ। খড়খড়ি দিয়ে হাওয়ার ঝটকা এল। একসময় বোধ হয় শার্সি ছিল খড়খড়ির গা-লাগানো। এখন নেই। শুধু কোণের দিকে সামান্য চিহ্ন রয়ে গিয়েছে কাচের শার্সির।

কুমুদ ফিরে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কুমুদ এল। হাতে কাগজে মোড়া কী যেন ছিল, দিল চুনিলালকে।

জিনিসটা নিল চুনি। হেসে বলল, "আমার তাড়া ছিল না।"

কুমুদও হাসল। তারপর জহরের দিকে তাকাল। "ও-বাড়ির খোঁজ নেবেন না?"

মাথা নাড়ল জহর। "না। যাঁর দরকার তিনি তো কিছু বলেননি আর।"

"চলি কুমুদ।" চুনিলাল পা বাড়াল।

নিচে নেমে দুই বন্ধু গলি দিয়ে হাঁটার সময় শীতটা আরও অনুভব করছিল। বাড়িগুলো যেন শীতে জড়সড়। গলির মধ্যে ধোঁয়ায় ভরা কুয়াশা জমেছে। আলোর মুখ ঢাকা পড়েছে হিমে, কুয়াশায়। বড় বিষণ্ণ দেখায়। একেবারে ফাঁকা গলি। একটা কুকুরও চোখে পড়ছে না। সমস্ত কিছুই এত ঝাপসা দেখাচ্ছিল যেন এই গলিটা কেমন অবাস্তব হয়ে উঠেছে। একটা জানলা দরজাও খোলা নেই কোনও বাড়ির। সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

সাড়া অবশ্য পাওয়া গেল। একটা রিকশা আসছে।

চুনিলালরা ততক্ষণে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখান থেকে পাশে তাকালে সাতাশের এক বাড়িটার অন্ধ গলি দেখা যায়।

রিকশাটাও ঠিক ওই জায়গাটিতেই থেমে গেল।

রিকশা থেকে প্রথমে নামল নিমাই। তারপর নামল একটি মেয়ে। গায়ে পুরো হাতা মেয়েলি সোয়েটার, তার ওপর একটা ছোট গরম শাল। হাতে প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ, তার মধ্যে পলিথিনের প্যাকেট। আরও হয়তো টুকিটাকি।

নিমাই রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মেটালো। তারপর ঘাড় তুলে মুখ ফেরাতেই চুনিদের দেখতে পেল। দেখল, কিছু বলল না।

মেয়েটির হাঁটতে বোধ হয় একটু অসুবিধে হচ্ছিল, খোঁড়াচ্ছিল। নিমাই তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল, ধরল। "এসো।"

ওরা অন্ধ গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

"কে বল তো? ওই মেয়েটা?"

"কে?"

"রত্না! বোধহয় কাজের জায়গা থেকে ফিরল। ছেলেটাকে তো খানিকটা আগে দেখেছিস কুমুদের বাড়িতে।"

"রত্না। তুই চিনিস?"

"নামে চিনতাম না। এই গলিতে কত মুখ দেখেছি। ওর মুখটাও দেখেছি, চিনতাম না। আজ চিনলাম।"

জহর তাকিয়ে থাকল অন্ধ গলির দিকে। অন্ধকারে রত্নাদের আর চোখে পড়ল না।

নয়

টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল। চুনিলাল সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে গিয়ে দেখল জিনিসটা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। জহর তার নিজের জায়গায় কম্বল গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে চুনিলাল হাত বাড়িয়ে জিনিসটা তুলে নিল। কাগজের মোড়ক ছিল ওপরে, ফেলে দিল, তার পর জহরের কাছে এসে বলল, "দেখেছিস?"

জহর দেখেনি। তবে ওটা যে কুমুদ চুনিকে ফেরত দিয়েছে আজ, জানে। চোখে পড়েছে।

"নে, দেখ।" চুনিলাল বলল, বলে পাশে বসল বন্ধুর।

জহর দেখল। পাথরের একটা গোল কৌটো। ধুসর রং পাথরটার, সামান্য সাদাটে ছিটে। দেখতে চমৎকার। কৌটোর ওপর ছোট্ট একটা ফুলের কাজ করা, ফুলে হালকা রং।

"খোল," চুনিলাল বলল।

জহর ঢাকনা খুলল। খুলেই অবাক। এক টুকরো ভেলভেট, প্রায় সাদাটে, তার ওপর কতকগুলো কড়ি। নানা রং।

"কাড় না?" জহর বলল।

"হ্যাঁ। আগে দেখেছিস?"

"সাদা কড়ি দেখেছি।"

"এগুলো দেখ," বলে চুনিলাল একটা কড়ি তুলল। উজ্জ্বল সোনার রং বলা যায় না, তবে সোনার মতনই, লালচে আভাও রয়েছে। বলল, "এই কড়িকে বলে 'সিংহী', স্বর্ণবর্ণ। দেখ ভাল করে।"

কড়িটা হাতে নিয়ে দেখল জহর। কী সুন্দর দেখতে, কী মসৃণ! স্বর্ণবর্ণ 'সিংহী'। না, আগে কখনও দেখেনি জহর।

"এটা দেখ—" দ্বিতীয় কড়িটা তুলল, চুনিলাল। "একে বলে 'ব্যাঘ্রী'। রংটা ধোঁয়ার মতন, এর বর্ণকে বলা হয় 'ধূম্রবর্ণ'। দেখেছিস আগে?"

মাথা নাড়ল জহর।

"নে এটা এবার হাতে নিয়ে দেখ। এই কড়িটার ওপর দিকটা হলদেটে, তলার দিকটা সাদা। এর নাম 'মৃগী'। সংস্কৃতে বলেছে, ওপর পীত, নিচে শ্বেত।"

"অদ্ভুত তো! এসব পেলি কোথায়?"

"দাঁড়া। এবার ওইটে দেখ। ওকে বলে 'হংসী' কড়ি। একেবারে সাদা। শ্বেত।"

"সাদা কড়ি দেখেছি। তবে এত সাদা নয়।"

"কোথায় দেখবি! খুব রেয়ার এখানে।....তবে ওই কড়ি দেখেছিস — ওই যে ছোট দেখতে...। ওর নাম 'বিদন্তা'। খর্বাকৃতি 'বিদন্তা'।"

জহর কড়িগুলো দেখতে লাগল। দেখার মতনই। পাঁচ রকম কড়ি, মাত্র পাঁচটি। বলল, "কী কী নাম বললি, গুলিয়ে গেল।"

চুনিলাল আবার বলল, "সিংহী, ব্যাঘ্রী, মৃগী, হংসী, বিদন্তা।"

"এসব পেলি কোথায়?"

চুনিলাল সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিতে উঠল। ছাইদান পেল না হাতে। সামনে, ভাঙা কাপে গুঁজে দিল। দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। কেমন অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে থাকতে বলল, "মা দিয়েছিল। সেই কবে! কলেজ থেকে বেরিয়েছি সবে। মা কোথায় গিয়েছিল বেড়াতে। সাউথে কোথাও। কোচিন কুইলন— হবে ওই রকম কিছু। মায়ের আবার মন্দির দেখার বাতিক। কোথায় পা রাখল কি মন্দির খুঁজে বেড়াল। তা ওই সব জায়গায় ঘোরার সময়, কোথায় তা আমি জানি না, মন্দিরের কাছাকাছি একটা দোকান ছিল — কিউরো শপ্ টাইপের। সেখান থেকে কিনেছিল। এসব কড়ি এদিকে বড় একট দেখা যায় না। সমুদ্রের মধ্যে এ-দ্বীপ সে-দ্বীপে পাওয়া যায়। আমি ঠিক জানি না। আমার কাছেই কৌটোটা ছিল। বরাবর। যত্ন করেই রেখে দিয়েছিলাম। মা বলেছিল, বুড়ো দোকানদার নাকি বলেছে — আরও একটা কড়ি আছে: সে পায়নি, তার কাছে নেই। যদি খুঁজে পান— তা হলে ইহজীবনে ভাগ্যবতী হবেন। শোক-তাপ-দুঃখ পাবেন না। ....মা অবশ্য তার কথা বিশ্বাস করেনি। আমিও নয়। ...আরে ভাই, দেখতে তো কত কী সুন্দর হয়, কত অসামান্য অদ্ভুত জিনিস আছে জগতে। আছে, থাক — তাতে আমার কী! আর তোর জীবনটাও তো অল-প্রুফ নয়! যা পাবার পেতেই হবে। আমি সে হিসেবে ভাগ্য বিশ্বাস করি না। তবে মনে হয়, অনেক সময় কত আগে থেকেই কেউ যেন কতকগুলো ব্যাপার মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে। কেমন করে — তা আমি বলতে পারব না। নয়তো হঠাৎ ওইভাবে কুমুদকে পাব কেন?"

জহর কী ভেবে বলল, "যেভাবেই হোক পেয়েছিস তো!"

মাথা নাড়ল চুনিলাল। বলল, "হ্যাঁ, পেয়েছি কিন্তু পুরোপুরি নয়। ইন্দ্রিয়ভোগ্য যা পেলাম তাতে সুখ পেতে পারি। কিন্তু আমি আরও বেশি কিছু চেয়েছি। ...আমি ওকে বাক্সটা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, দেখো ভাল করে। আর যদি পার তবে বাকি কড়িটা ভরে দিও। ও দেয়নি। পারেনি। আমি পারিনি। পারতাম না।"

"তুই পারতিস। আমি তো দেখলাম কুমুদকে তুই কত ভালবাসিস!"

"ভালবাসি। তবে 'কত' নয়। বেশি ভালবাসা হল সেই ধরনের আগুন যা দাউদাউ করে জ্বলে না, অথচ ভেতরে জ্বলে গনগন করে। গায়ে লেগে থাকলে গা ঝলসে যাবে। পুড়ে যাবে। সেটা সহ্য করা মুশকিল। আমি আমার মায়ের মতন। পুড়তে চাই না। কুমুদও পারবে না। তার চেয়ে ওই যে দেখলি — নিমাই আর রত্নাকে —দেখলি — ওদের মতন সাদামাটা সরল ভালবাসা অনেক ভাল।"

"মানলাম। তবে তোরটাই বা কম হবে কেন! আমার মনে হয়, তুই ভুল করছিস।"

"করতে পারি! ভুল না করলে জীবনটা নিছক মগজের কারবার হয়ে যায়। তবে রক্ষে এই যে, মগজও ভুল করে। ...যাক গে, আমি তো হপ্তাখানেক পরে মাকে আনতে যাব। মহিলা আসবেন কিনা জানি না। জেদ করব, তবু যদি আসতে না চায় তখন বলব, তোমার দেওয়া কড়ির কৌটো আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। তুমি আমায় ঠেকাতে পারবে না।"

জহর শুনল। কথা বলল না। কড়িগুলো গুছিয়ে কৌটোয় ভরে রাখল। "শোন —" বলে হাসল, "যদি কোনওদিন বাকি কড়িটাকে খুঁজে পাস — তা হলে তোর ওই সিংহী, ব্যাঘ্রী, মৃগীর সঙ্গে মিলিয়ে সেটার নাম দিবি হস্তিনী।"

চুনিলাল প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে খেয়াল করল। হেসে উঠতেই যাচ্ছিল, হাসল না।

স্বপ্নবিলাসের সাধুসঙ্গ

বিলাসের অনেক নাম। পুরো নাম শ্রীবিলাস দে। আশপাশের গরিবগুর্বো দেহাতিরা বিলাসকে বলে বিলাইতিবাবু। বিলাসের মধ্যে বিলেতের ছিটেফোঁটাও নেই। তবু বলে, কারণ বিলাসের গায়ের রং অস্বাভাবিক ফর্সা, লালচে আভা ধরানো, অনেকটা ধবল-রোগীর মতন বর্ণ যেন। মাথার চুল ছোট, কোঁকড়ানো, লালচে ধরনের। চোখের মণি ধূসর। তার গায়ের রং, চুল, চোখের জন্যে হয়ত সে বিলাইতিবাবু। অন্য কোনও কারণে নিশ্চয় নয়। ওর জন্ম-রহস্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। প্রকৃতির কত রকম খেয়াল থাকে, কত যে গোপনতা তা কি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব!

চেহারার বাইরের এই দিকটা বাদ দিলে বিলাস একেবারে ষোলআনা এ-দেশি। মাথা তেমন লম্বা নয়, মাঝারি মাপের। হাড়-ওঠা খটখটে শরীর। হাত-পায়ের গড়ন থেকে তার শক্তি-সামর্থ্যের আন্দাজ হয়। মুখ একেবারে গোল, নাক সামান্য ভোঁতা। ঝকঝকে দাঁত।

বিলাসের বেশবাস সাধারণ। ধুতি আর শার্ট ছাড়া সে অন্য কিছু পরে না। ঘরে পাজামা পরার অভ্যেস আছে। ধুতি পরার সময়ও তার বাবু-ভাব নেই। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে সাধারণত। তাতে সাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরার অনেক সুবিধে। পায়ে মোটা চপ্পল।

মাঝে রেল লাইন, দু'পাশে বালিয়াড়ি আর মাটির ঢিবি, পুবে হাটতলা, ঘোড়া নিম কাঁঠালের মস্ত মস্ত গাছ; পশ্চিমের বালিয়াড়ির গা ছুঁয়ে শুধু মাঠ আর মাঠ, উঁচু নিচু, ঝোপঝাড় কাঁটাগাছে ভর্তি — এই দিকটাতেই বিলাসের বাস। লোকের মুখে মুখে এ পাশের নাম হয়েছে 'কেশব পল্লী'। ঘর-বাড়ি বিশেষ একটা নেই এ পাশে; দশ-বারোটি বড়জোর। ওই কেশব পল্লীর যে বাড়িতে থাকে বিলাস নামটি তার একেবারেই সাদামাটা। 'পার্বতী নিবাস'।

কুড়িটা বছর এই পার্বতী নিবাসেই কেটে গেল বিলাসের। পার্বতীকে দেখেনি বিলাস। শুনেছে হাজরামশাইয়ের স্ত্রী ছিলেন পার্বতী দেবী। বাড়িতে ছবি দেখেছে পার্বতীর, ফোটো নয়, হাতে আঁকা। সেই ছবি এখন অবশ্য নেই। হাজরামশাইও নেই। তিনি যখন ছিলেন, রেল ফটকের গায়ে কাঠগোলায় বসে বসে ব্যবসা দেখতেন তাঁর

— তখন একদিন বিলাস তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছিল। ছেঁড়া ধুতি, ময়লা চিট জামা, পায়ে ধুলো ভর্তি নোংরা কেডস্, সাইকেলের কেরিয়ারে একটা মামুলি পুঁটলি। তখন বিলাসের বয়েস কুড়ি।

'কী চাই?'

'একটু জল খাব।'

'ও! এসো।'

কাঠগোলার গায়েই ইঁদারা। হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে বিলাস আবার হাজরামশাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

হাজরামশাই তাকে দেখছিলেন প্রথম থেকেই। কৌতূহল যথেষ্ট। 'কী নাম তোমার? কোথ্ থেকে আসছ?'

'আম্মার নাম শ্রীবিলাস দে। আসছি ঘুরতে ঘুরতে। এখন আসছি ডিহা গালুই থেকে।'

'তোমার বাড়ি?

'বাড়ি বলে কিছু নেই।'

'মা বাবা?'

'বাবাকে চোখে দেখেনি। মা বনশালের হাসপাতালে খাটত। ঘা হ'ল পেটে গভ্ভে। মারা গেল।'

হাজরামশাই একেবারে চুপ। কী যেন দেখছিলেন, ভাবছিলেন। তারপর ডাকলেন একজনকে। বললেন, এই ছোকরাকে মদন হালুইয়ের দোকান থেকে খাইয়ে আন। যাও তুমি। পরে কথা হবে।

সেদিন থেকেই বিলাস হাজরামশাইয়ের আশ্রয়ে। মশাইকে প্রথমে বাবু বলত; পরে বাবা।

আট বছর হাজরাবাবার সঙ্গে থাকল বিলাস। সে লক্ষ করেছে বাবার মাঝে মাঝে কৌতূহল হ'ত বিলাসের জন্ম এবং বাল্যকথা জানতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতেও চেয়েছেন একথা সেকথা, বিলাস বলতে পারেনি।

হাজরাবাবার কেউ ছিল না। বিলাসকে নিয়েই থাকতেন তিনি পার্বতী নিবাসে। অদ্ভুত মানুষ। মারা যাবার আগে নিজের দাহকর্মের জন্যে আমলকী জঙ্গল আর ছুরকি নদীর — নালাও বলা যায়— একটা জায়গা বেছে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, চোত বা বোশেখে আমি অন্ধ হ'ব; ভাদ্দর আশ্বিনে মারা যাব। তুমি আমারে দাহ করবে ওই জায়গাটায় — তোমায় দেখিয়ে রেখেছি।

বিলাস বিশ্বাস করেনি কথাগুলো। মানুষের মৃত্যুর কথা সে কেমন করে আগে বলতে পারে!

অথচ ঘটনা ওই রকমই ঘটল শেষ পর্যন্ত। হাজরাবাবা সত্যি অন্ধ হয়ে গেলেন বৈশাখের শেষাশেষি। ভাদ্র মাসে মারা গেলেন।

আট-আটটা বছর হাজরাবাবার সঙ্গে পার্বতী নিবাসে কাটানোর পর বিলাস একা। তার বয়েস তখন আঠাশ। বাবা চলে যাবার পর সবই ফাঁকা। বাড়িতে কারও ডাক নেই, সাড়া নেই, চটির শব্দ নেই, বাবার ঘর থেকে চুরুটের গন্ধ ভেসে আসে না, কেউ সুর করে রামায়ণ পড়ে না, ও ঘর থেকে টিকটিকিগুলোও যেন পালিয়ে গিয়েছে—চোখে পড়ে না, দেওয়াল ভরে শুধু ধুলো জমে শীতের, পৌষ মাঘের কনকনে ঠাণ্ডায় কাঠকয়লার আগুন জ্বলে না মালসায়।

নিজেকে সামলাতে অনেক সময় লাগল বিলাসের। কাঠগোলাতেও আর মন টানে না।

তবু সময় চলে যায়। চৌত্রিশ বছরে বিলাস বিয়ে করল। বউয়ের নাম শিবানী। মেয়েকে পেল গয়ার দিকে। মাসিপিসিদের সঙ্গে মেলায় এসেছিল। দু-তিনটে ছোকরা কম বয়েসের মেয়ে পেয়ে লুঠ করে মজা করেছে মেলার এক তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে। সেখানে কলেরা রোগের ক্যাম্প বসানো ছিল।

মাসিপিসি ওকে নেবে কেন?

বিলাস গিয়েছিল মেলায়। শিবানীকে নিয়ে এল।

বিয়ের পর তো মন্দ কাটছিল না। তবে ভাগ্য খারাপ! শিবানীর পেটে দু'বার সন্তান এল। নষ্ট হ'ল। তারপর আর এল না।

এখন বিলাসের বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শিবানী তিরিশ।

কাঠগোলার ব্যবসা কবেই ছেড়ে দিয়েছে বিলাস। তার অত মাথা বা সাহস নেই যে অন্য দু-একজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলা চালায়।

অত ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় না গিয়ে বিলাস এখনকার বাসডিপোর গায়ে একটা হোটেল খুলেছে। ছোট হোটেল। ডাল ভাত রুটি সবজি দই, এক আধ দিন মাংস মাছ। চা পাওয়া যায়।

হোটেলের পাশাপাশি আরও এক দায় আছে বিলাসের। এখানে পাঁচ ছ'টা বাড়ির সে কেয়ারটেকার। পুজো আর শীতের মুখে যারা জল হাওয়া বদলাতে আসে এখানে তাদের কেউ কেউ যোগাযোগ করে বিলাসের সঙ্গে। বাড়িঅলারা কলকাতায়, শিবপুরে, কেউ বা জামশেদপুরে, বর্ধমানে, ওদিকে পাটনায়। বাড়িগুলো বাপ-ঠাকুরদার আমলের। সস্তাগণ্ডার দিনে টাকা ঢেলে বাড়ি করেছিলেন ভদ্রলোকরা শখ করে। তাঁদের আমলে আসা-যাওয়া ছিল মালিকদের। এখনকার মালিকরা আসেন কদাচিৎ। বাড়িগুলো ভাড়া খাটান সিজন টাইমে। এঁদের কেউ কেউ বিলাসকে বাড়ির কেয়ার টেকার করে রেখে দিয়েছেন। বাড়ির দেখাশোনা ছাড়াও ছুটির মরসুমে বাড়ি ভাড়া

দেওয়া, টাকাপয়সা আদায় বিলাসই করে। বিলাসের হাতেই বাড়ির দায়দায়িত্ব

সামান্য এই কাজের জন্য টাকাপয়সা নেয় না বিলাস। কেনই বা নেবে! 'উষাবীথি'র সাধন মল্লিক বিলাসের যথেষ্ট জানাশোনা, 'কমলা কুটিরে'র মালিকানি থাকেন শিবপুরে, বিধবা মহিলা, বিলাসকে 'বাবা' বলে কথা বলতেন—তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়া! রাম রাম! এই রকমই আরো কয়েকটা বাড়ি, 'বিজলী কানন' 'রুবি ভিলা' 'মাধবী স্মৃতি'।

মালিকদের কেউ যদি বলেন, তোমার হাতে তো কিছু দেওয়া উচিত, বিলাস। সারা বছর তুমি বাড়িগুলো দেখাশোনা করছ। তুমি না থাকলে বাড়ির দরজা জানলা খুলে নিয়ে চলে যেত এরা। বাড়ি বাগান — সবই তোমার দয়ায় টিকে আছে। মালীগুলো নামেই মালী, আসলে ফাঁকিবাজ, চোর।

জবাবে বিলাস বলে, আমার হাতে দিয়ে কী করবেন দাদা! অভাব থাকলে নিতাম। অভাব আমার নেই। মাথা গোঁজার জায়গা আছে, পেট চালাবার জন্যে হোটেল আছে। দুটি মাত্র মানুষ আমরা। আপনারা আমায় বিশ্বাস করে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন সাধ্যমত দেখি, এর বেশি আবার কী!

সাধন মল্লিক একবার বলেছিলেন, বিলাস তোমার হোটেলটা ভাল করে সাজিয়ে নাও না, ওর চেহারা দেখলে ঝুপড়ি মনে হয়! পাকা বাড়িটাড়ি করে নাও! কত আর খরচ পড়বে! টাকার জন্যে আটকাবে না।

বিলাস হেসে বলেছিল, কাঁচাতেই এতকাল চলল বড়দা, পাকা করে কী হবে! ওই আমার ভাল।

বাসডিপোর গায়ে বিলাসের হোটেলের চেহারা একেবারে মামুলি। খাপরা ছাওয়া ছোট বাড়ি, সামনে খানিকটা লম্বা বারান্দা, মাথায় টিন। সামনে একটুকরো মাঠ। আশপাশে গাছপালা। হোটেলের বসার জায়গা অল্প। চেয়ার নেই, দু-একটা ছাড়া, লম্বা তিনটে বেঞ্চি, খাবার জায়গা বলতে লম্বাটে সরু উঁচু টেবিল। শালপাতায় খাওয়া, জলের গ্লাস স্টেনলেইস স্টিলের। বাটি চাইলে মাটির খুরি। তবে সাদামাটা ডাল ভাত রুটি সবজি হলেও রান্নাটা খারাপ হয় না। যারা সময় অসময়ে ট্রেন থেকে এসে নামল স্টেশনে, তারপর হাঁ করে বসে থাকল বাস ধরবে বলে—তারা এখানেই দুটো মুখে দিয়ে নেয়। বা যারা তিরিশ মাইল বাস ঠেঙিয়ে সন্ধের পর পর এসে নামল এখানে, ট্রেন ধরবে সেই রাত দশটা বারোটায় তারাই বা খাবে কী? বিলাসের হোটেলেই তাদের গতি।

বিলাসের হোটেলের পোশাকি কোনও নাম নেই। লোকে অবশ্য মুখে মুখে নাম দিয়েছে, বিলাসবাবুর হোটেল।

বিলাসের বন্ধুরা রসিকতা করে বলে, হোটেল বিলাস।

বিলাসকে নিয়ে এই কাহিনী শুরু করার আগে আরও দু-একটা কথা বলে নিতে হয়।

মানুষ হিসেবে বিলাস সাধারণ সরল ভদ্র উদার। তার মধ্যে কোনও জটিলতা চোখে পড়ে না। সে লোভী নয়, আবার বোকাও নয়। বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসের রাগারাগি নেই, কলহ নেই, এমন কী শিবানীর সন্তানহীনতা নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দুঃখ জানানোর অভ্যাসও নেই। সংসারে এরকম হয়েই থাকে, কেউ পায়, কেউ পায় না। না পেলে পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে লাভ কিসের! স্ত্রীকে এত কথা বোঝাবার দরকারও হয়নি বিলাসের বার বার। শিবানী বুঝে গিয়েছে নিজেই।

স্বামীকে নিয়ে শিবানীর কোনও অভিযোগ নেই। এক আধদিন অল্পস্বল্প মান-অভিমান তো হবেই; না হলেই বরং সাংসারিক দাম্পত্য জীবন স্বাদহীন হয়ে ওঠে। বিলাস মজা করে বলে, বুঝলে গো, পাকা সোনায় ভাল গয়না হয় না, একটু খাদ দিতেই হয়। সংসারেও তাই মাঝে মাঝে খেপাখেপি করতে হয়— করলে বউকে আরও বাহারি লাগে।

তা এখন আর বাহারেরই বা দরকার কিসের! বিলাসের বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়ে গেল, শিবানীর ত্রিশ। দাম্পত্য জীবনও বেশ কয়েক বছরের পুরেনা হয়ে গেল, এখন কে আর বাইরের বাহার দেখে!

সবই মোটামুটি ভাল। শুধু দুটো ব্যাপারে শিবানী খানিকটা অধৈর্য হয়ে ওঠে। বা বলা যায়, কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

বিলাস মাঝে মাঝে তার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে নেশার হিসেবটা ভুল করে ফেলে। তারপর রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় সাইকেল নিয়ে এখানে ওখানে আছাড় খায়। কোনও দিন হাঁটু ছড়ে যায়, কোনও দিন পায়ের গোড়ালি বা হাতের কব্জি জখম হয়। একবার পড়ে গিয়ে কপাল ফাটিয়ে ছিল। ওই অবস্থায় কেউ বাড়ি ফিরলে কার না রাগ হয়! স্বামীর ওপর রাগ ছাড়াও রাগ হয় তার বন্ধুদের ওপর ঃ রেলের নিরাপদ আর ভৌমিকের ওপর, বাসডিপোর দক্ষিণ বাবুর ওপর, বাজারের চাটুজ্যে, বদ্ধ কালা প্রসাদ সিনহার ওপর। রাগের চেয়েও বেশি ভয়। কোনোদিন যদি সাইকেল নিয়ে রেল ফটকের ওপর লাইনে পড়ে! হরদম তো মালগাড়ি আসছে যাচ্ছে লাইন দিয়ে। রেল ফটকের বিপদ বাদ দিলেও অন্য একটা বিপদ আছে। পুকুর। সে পুকুর কম নয়, প্রায় দিঘি। একপাশে উঁচু পাড়, খেজুর গাছ। এ পাশে রাস্তা। কাঁচা পথ। ওই পথ দিয়েই আসা-যাওয়া বিলাসের। নেশায় যার চোখ বুজে থাকে সে যদি কোনোদিন ভুল করে ওই পুকুরে গিয়ে পড়ে, আর কি উঠতে পারবে!

'ওই ছাই একটু কম গিললে ক্ষতি কী?'

'ভৌমিক আমায় তাতিয়ে দিল! বলল, বউয়ের ভয়ে খাবি না! গায়ে গন্ধ হলে বউ

পাশে শুতে দেবে না, শালা! .... আমি বললাম চুপ কর। আমার বউ তোর বউ নয়। মাই ওয়াইফ্ ইজ মাই ওয়াইফ্, গন্ধের পরোয়া করে না। বুকে টেনে নেয় বুঝলি। তোর বউ, তোকে ঠেলে বাড়ির বাইরে বুকিং অফিসে শুতে পাঠিয়ে দেয়। আমার বউ গডেস।'

শিবানী আর কী বলবে এই মানুষকে। মাঝরাতে, যখন চারপাশে শুদু ঝিঁঝি ডাকছে, জানলা দিয়ে তাকালে অন্ধকার আর আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে, বাতাস বয়ে যাচ্ছে দমকে দমকে —তখন সত্যিই বুকে টেনে নিতে হয় মানুষটাকে, গন্ধ আর নাকে লাগে না।

এই দিনগুলোর কথা বাদ দিলে, মাঝে মাঝে অন্য যে কারণে সে স্বামীর ওপর বিরক্ত হয়— তাকে মানুষটার পাগলামি বলা যায়।

বিলাস প্রায়ই এলোমেলো আজেবাজে অদ্ভুত অর্থহীন স্বপ্ন দেখে। দেখার পর পরই, কিংবা আধা-ঘুম আধা-চেতনার মধ্যে শিবানীকে জাগিয়ে দেয়। হয়ত তখন মাঝ রাত, হয়ত শেষ রাত।

শিবানী, শিবানী — শোনো, এই শোনো না, আমি কী স্বপ্ন দেখছিলাম জানো! হাজরাবাবাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। বাবা বলছিল, তোর জায়গাটা দেখে রাখ। পরিষ্কার করিয়ে রাখ। কোথায় তোর দাহ হবে ঠিক করে না রাখলে কে কোথায় তোকে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক কী!

শিবানী শোনে স্তব্ধ হয়ে।

দুই

বিলাসের আরেক নাম হয়ে গিয়েছে, স্বপ্নবিলাস। নামটা দিয়েছে বন্ধুরা। বন্ধু মানে কিরীট, বিলাসেরই এক ইয়ার দোস্ত। বন্ধুদের দোষ নেই, কিরীটেরও নয়। মাসে ছ' মাসে কেউ যদি বলে, জানিস রে, কাল একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম - তবে শ্রোতা হিসেবে বন্ধুরা ধৈর্য ধরে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনতে পারে, হাসি-তামাশা হয়ত করে না। কেননা স্বপ্ন কে আর না দেখে, আর স্বপ্নের মধ্যে কিছু অদ্ভুত ব্যাপা তো থাকবেই। স্বপ্নের পা নেই, ডানা আছে; মাটি দিয়ে সে হাঁটে না, তার ডান পায়ে জুতো ডান পায়েতেই থাকবে, বাঁ পায়ের জুতো বাঁ পায়ে — এমন হয় ন এলোমেলো, অযৌক্তিক, অবাস্তব তো কিছু থাকবেই। বিলাসের বন্ধুরাও কথাটা জানে মেনে নেয়। কিন্তু একটা লোক যদি প্রায়ই, দশ বারো দিন অন্তর একটা করে অদ্ভু

কিংবা প্রায়-অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনাতে চায় — বন্ধুরা তাকে কী বলবে! বলবে, পাগল। মাথায় গোলমাল আছে। বেটার ভাল ঘুম হয় না। পেট গরমের ধাত। শালার ঠিকমতন মাল হজম হয় না।

তা এসব কথা, হাসিঠাট্টা বন্ধুরা অনেক করেছে। লাভ হয়নি। উলটে বিলাসের অভিমানে লেগেছে। সে অনেক দিন ধরেই বন্ধুদের আর স্বপ্নের কথা বলতে চায় না। ইচ্ছে হয়, তবু বলে না। বন্ধুরা বিলাসকে ভালবাসে। তার অভিমানও বুঝতে পারে। নিজেরাই মাঝে সাঝে বলে, 'কী রে! তুই আর স্বপ্ন দেখছিস না! দু-একটা শোনা।'

বিলাস বলে না। বা কদাচিৎ বলে।

কিরীটই একমাত্র বন্ধু যাকে এখনও মাঝে মাঝে সে তার দেখা স্বপ্নের কথা বলে। কিরীট কিছু শোনে, কিছু শোনে না। তবে একেবারে হতাশ করে না বিলাসকে। বরং 'স্বপ্নবিলাস' নামটা চালু করে দেবার পর কিরীটই হেসে বলেছিল, 'দেখো দাদা, তোমার বিলাস শ্রীবিলাস নামটা একেবারে গাঁইয়া ছিল, নামটা স্বপ্নবিলাস করে দিলাম। একেবারে হাল ফ্যাশানের নাম। তুমি একটা এফিডেবিট করিয়ে নাও।

বিলাসের তেমন কোনও ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন। এফিডেবিট কেন করাবে! এখানে এফিডেবিট হয় না। কোর্টকাছারি জজ ম্যাজিস্ট্রেট নেই এখানে। জায়গাটা সদর নয়, বড় শহর নয়, এমন কী মাঝারি শহরও নয়। রেলের খাতায় রোড সাইড স্টেশন। ট্রেন যায়, দু-একটা মেইল এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়াবার ব্যবস্থাও আছে। মিনিট পাঁচেকের বিরতি। যেন দয়া করেই। তার পরই ঘন ঘন হুইশল। প্যাসেঞ্জার গাড়ি হলে কথা নেই, গোরুর গাড়ির মতন গড়িয়ে গড়িয়ে এসে দাঁড়াল তো দাঁড়াল, আর নড়তে চায় না। মালগাড়ির অবশ্য অনবরত আসা-যাওয়া। রোড সাইড স্টেশন, কিন্তু প্ল্যাটফর্ম একেবারে এ-প্রান্ত সে-প্রান্ত। বেশ লম্বা। দু দুটো প্ল্যাটফর্ম। চমৎকার তার চেহারা। লালচে মোরাম, স্টেশনের অফিসঘর, শেড, একটা টি স্টল, খাবার জলের কল গোটা দুই, সিমেন্টের বেঞ্চ, ওভারব্রিজ; আর কৃষ্ণচূড়া, করবী, কলকে ফুলের গাছ। ছবি বললেও বলা যায়।

স্টেশনের বাইরে বুকিং অফিস, মুসাফিরখানা, মিঠাইঅলার দোকান, চা-অলাদের আড্ডা। খানিকটা তফাতে বাসডিপো। দু-একটা ট্রেকার। বাসগুলো অনেক দূর ছোটাছুটি করে। সত্তর আশি মাইল তো বটেই। সদর এখান থেকে মাইল পঁয়ত্রিশ। তারপর এদিক ওদিক আসা-যাওয়া। বাসের রাস্তা কিন্তু চমৎকার। গাছপালা, বন-জঙ্গল, পাহাড়ি খাদের গা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে পাঁচ পথ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

জায়গাটা একসময় যত নির্জন, বসতিহীন ছিল — এখন তা নেই। আগে ছিল হাওয়া-বদলানোর জায়গা। তিন দিকে তিন এলাকা বা পাড়াও গজিয়ে উঠেছিল। বাইরের সম্ভ্রান্ত ধনীবাবুরা যে দশ বিশটা বাড়ি বানিয়েছিলেন তার চেহারায়

বনেদিআনা ছিল। বাগানে থাকত ফোয়ারা, কুঞ্জ, কোথাও কোথাও পাথরের পরী। এই পাড়ার একেবারে উলটো দিকে গড়ে উঠল, মাঝারি ধনীদের বাড়ি : 'মীনা লজ' 'হেম কুটির' 'মাতৃস্মৃতি' 'কমল ভিলা'। এই দুইয়ের মাঝামাঝি বিক্ষিপ্তভাবে যারা ঘরবাড়ি করেছিল তারা ছাপোষা মানুষ। সাধারণ বাড়ি, খানিকটা বাগান।

বিলাসের 'কেশব পল্লী' এই এলাকার মধ্যে পড়ে না। সেটা যেন সিকি মাইল তফাতে পালিয়ে গিয়েছে।

স্টেশনের দক্ষিণে বাজার-হাট দোকান, থানা, একটা স্কুল আর ইউনিয়ন বোর্ডের ছোট হাসপাতাল। রোগীও তেমন আসে না, এসে লাভ নেই, ওষুধ থাকে না হাসপাতালে, আর ডাক্তারসাব মাসের মধ্যে কুড়ি দিন সদরে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন। এক-চোখ কানা বেচারি কম্পাউন্ডারই ডাক্তার।

বিলাস আজ কুড়ি বছর এখানে দিব্যি থেকে গেল। তার কাছে এর চেয়ে পছন্দের জায়গা আর নেই।

শিবানীও অন্য কোথাও যাবার কথা বলে না। কেনই বা বলবে! তার কি কোথাও যাবার জায়গা আছে? নেই। বাপের বাড়ির লোকগুলো তার মন থেকে মুছে গিয়েছে কবেই। এক আধটা পোস্টকার্ড আগে আসত, পাঁচ সাত বছর আগে, আর আসে না। শিবানীর তাতে আফসোস নেই। সে বেশ আছে। এর চেয়ে ভাল থাকে কোন্ মানুষ! সবই ভাল, শুধু স্বামীর ওই রোগ ছাড়া তার অন্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আবার এটাও সত্যি কথা, রোগ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও তো ওটা নয়। বাতিক টাতিকও না। স্বভাব। স্বভাব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

সেদিন এক ঘটনা ঘটল।

কালীপুজো সবে শেষ হয়েছে। শীত আসছে পায়ে পায়ে। এখানে এই রকমই, কার্তিকে নাড়া অগ্রহায়ণে জাড়া। পৌষ মাসে কথাই নেই। বনজঙ্গলের জায়গা যে, মাইল কয়েক দূরে পরেশনাথের মাথা আর ঢল।

সময়টা এমনিতে ভাল। তবে প্রথম শীতের হিম ভাল নয়। মাথায় লাগলেই জ্বর-জ্বালা, কাশি।

বিলাসদের শোওয়ার ঘরে বড় খাটটা দক্ষিণ ঘেঁষে পাতা। মাথার দিকে জানলা। জানলা বন্ধই ছিল। পায়ের দিকে জানলা খোলা। পাশের জানলাটা ভেতর দিকে সেটাও খোলা।

দু'জনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। শিবানীর গায়ে ওয়াড়-পরানো ভুট কম্বল। এখনও লেপ বার করার সময় হয়নি। বিলাসের গায়ে পাতলা কম্বল। শিবানী বরাবরই কুঁকড়ে শুয়ে থাকে, তার অভ্যেস। পাশবালিশ জড়িয়ে না শুলে তার ঘুমও হয় না। শিবানী

নিজের স্বভাব এবং অভ্যেস মতন শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। বিলাস ছাদমুখো হয়ে শুয়ে থাকে, পাশ ফেরে কম। তার হাত দুটোই যা ঘুমের ঘোরেও স্থির থাকে না, কখনো মাথার ওপর, কখনো পাশে ছড়ানো থাকে।

ঘুমের মধ্যেই, তখন হয়ত শেষ রাত, বিলাস হঠাৎ যেন লাফ মেরে বিছানার ওপর উঠে বসল। উঠে বসে দু'মুহূর্ত বাকরুদ্ধ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেই যেন, ভীত বিহ্বল, তার পরই শিবানীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। শিবানী, শিবানী।

স্বামীর প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে, ভয়ার্ত ডাক শুনে শিবানী ধড়মড় করে উঠে বসল।

"কী হ'ল?"

"তুমি কই?"

"এই তো!"

"আলোটা জ্বালো।" বিলাসের গলার স্বর জড়ানো, ভাঙা। কাঁপছে।

বালিশের পাশে টর্চ থাকে। এখানে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। লণ্ঠন আর টর্চই ভরসা। শিবানী টর্চ হাতড়ে নিয়ে জ্বালল।

"কী হয়েছে?" স্বামীর মুখ দেখতে দেখতে বলল শিবানী।

বিলাসের মুখের ভাব স্বাভাবিক নয়। কিসের যেন ভয় পেয়েছে, খানিকটা বিহ্বল, উদভ্রান্তের মতন লাগছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। স্ত্রীর হাত ধরে টর্চের আলো শিবানীর দিকে ঘুরিয়ে দিল। দেখছিল শিবানীকে।

শিবানীর মাথার চুল এলোমেলো। কপালে মাখামাখি। সিঁথির সিঁদুর লেপটে আছে মাঝ-কপালে। গায়ে পুরোপুরি আঁচল নেই শাড়ির। জামার ওপর দিকে বাঁধন খোলা, শ্যামলা স্তন দেখা যাচ্ছিল। গলার সরু হার একপাশে সরে গিয়েছে।

"কী গো! কী হয়েছে?" শিবানী আবার বলল।

বিলাস আলোটা সরিয়ে নিল।

শিবানী অনুমান করে নিল। সে আন্দাজ করতে পারে। "স্বপ্ন দেখেছ?"

বিলাস মাথা নোয়ালো, "হ্যাঁ।"

"ভয় পেয়েছ?"

বিলাস একবার চোখ রগড়ে নিল। "তুমি পঙ্গপাল দেখেছ?"

"পঙ্গপাল! না। শুনেছি।"

"আমি দেখেছি। আগে দেখেছি একবার। ছেলেবেলায়। গঙ্গামাটিতে ছিলাম। হঠাৎ যেন মেঘ এসে পড়ল। কালো। তারপর দেখি চারপাশে ছেয়ে গেছে। লোকে চিৎকার করে উঠল, পঙ্গপাল। ধানের খেত ভরে গেল। শেষে সব সাবাড়, ধানের মাথা আর খুঁজে পাই না।"

"সে আগের কথা। এখানে কী?"

"আজ আবার দেখলাম। পঙ্গপাল বলেই মনে হ'ল। তুমি আমি একটা সাঁকোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি। মাঠ, মেঠো পথ, ঝোপ, দুপুর না বিকেল বুঝতে পারিনি, হঠাৎ ঝাঁক বেধে এসে পড়ল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভেবেছি ফড়িং। তার পরই দেখি পঙ্গপাল, পঙ্গপালের মতন। শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। কী কালো আর বড় বড়। তোমাকে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলাম। পারলাম না। তুমি ওদের তাড়িয়ে ক'পা মাত্র এগিয়ে মাটিতে পড়ে গেলে। তারপর দেখি তোমার শাড়িজামা কিছুই নেই। তুমি উলঙ্গ। মুখ থুবড়ে হাত ছড়িয়ে পড়ে আছ মাটিতে, আর শ'য়ে শ'য়ে পঙ্গপাল তোমার গায়ে। তোমাকে দেখা যাচ্ছিল না। একফোঁটাও নয়। পিঁপড়ের দল যেভাবে খাবারের টুকরো ঢেকে ফেলে সেইভাবে তোমায় ওরা ঢেকে ফেলল। আমি কিছুই করতে পারছিলাম না। শুধু পাগলের মতন চেঁচিয়ে যাচ্ছিলাম। শেষে একটা কী ঝোপ থেকে ভেঙে নিয়ে ছুটে গেলাম। ততক্ষণে পঙ্গপালের সেই দল উড়ে যাচ্ছে। মাটিতে কিছু নেই। তোমার শরীরের একটুকরো মাংসও নেই। একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। শুধু কঙ্কাল। কোথায় তুমি।" বলতে বলতে বিলাস হাত বাড়িয়ে শিবানীকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে কাছে টানতে লাগল।

শিবানী স্বামীর গায়ে টলে পড়তে পড়তে বলল, "এই স্বপ্ন! খারাপ স্বপ্ন ঠিকই। তবে তাতে কী! স্বপ্ন স্বপ্নই! আর তুমি তো কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখো!"

নিজের বুকে স্ত্রীর বুক লাগিয়ে ঘন করে জড়িয়ে ধরে বিলাস বলল, "আরও খানিকটা আছে স্বপ্নের। ....আমি কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে আছি। বিশ্বাস করতে পারছি না। ভীষণ ভয় লাগছিল। ছুঁতেও পারছি না তোমাকে। এমন সময়, এমন সময়ে — একটা লোক কোথ্ থেকে এসে হাজির। খেপা সাধুসন্ন্যাসীর মতন দেখতে। লোকটা তোমার কঙ্কাল দেখতে দেখতে বলল, আয়— আমার কাছে আয়। তারপর দেখি, কঙ্কালের হাড়গুলো টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল। যেন শুকনো পাতা উড়ছে, টুকরো উড়ছে খড়ের। ....আমি তার সামনে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে....।"

বিলাস থরথর করে কাঁপছিল।

স্বামীকে নিজের বুকের মধ্যে যেন আরও নিবিড় করে টেনে নিয়ে শিবানী কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর বলল, "বাদ দাও। এই তো আমি আছি। নাও শুয়ে পড়। ভোর হয়ে আসছে।"

জানলার বাইরে তখন সবে অন্ধকার হালকা হচ্ছিল।

স্বপ্নটা ভুলতে পারছিল না বিলাস। চোখের তলায়, মাথার মধ্যে যেন অনবরত দুলে উঠছিল।

রোজকার মতন সামান্য বেলায় সাইকেল নিয়ে হোটেলে গেল। দিনের বেলাটা

তার হোটেলেই কাটে। চাল ডাল তেল আটার হিসেব, খাতা লেখা, মাল আনানো, শাক-সব্জির বাজার, কয়লার জন্যে বিরিজলালকে ধমক, ওরই মধ্যে কোনো বাস এলে খরিদ্দারদের দেখাশোনা।

বিলাসের হোটেলে সাকুল্যে পাঁচটা লোক খাটে। দুটো বাচ্চা আর তিনটে ধেড়ে। তিন ধেড়ের একজন রাঁধুনি, একজন জোগানদার, আর একজন তদারকি বুড়ো। পয়সাকড়ি নেওয়া-দেওয়ার দায়িত্বও তার।

বেলা এগারোটা নাগাদ ডাক পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল বিলাসকে। হোটেলেই। হোটেলেই সুবিধে ডাক বিলির।

ইনল্যাণ্ড চিঠিটা সাধন মল্লিকের।

মল্লিকবাবু লিখেছেন ঃ বিলাস, আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমাদের খবর ভাল নয়। তোমাদের বড় বউঠাকুরন হাত ভেঙে বসে আছেন। আমি বাতে কাবু। বিজয়ার চিঠিতে আমি তোমায় জানিয়েছিলাম যে, শীত পড়লে দিন পনেরোর জন্যে একবার যাব ওখানে। গত বছর যাব যাব করে যাওয়া হয়নি। এবারও হ'ল না। পরের বার একবার চেষ্টা করব। ছোটবাবুর শ্বশুর গত হয়েছেন — সেটাও আটকে গেল।

যে-জন্যে তোমায় ওই জরুরি চিঠি লেখা সেটা জানাই। আমাদের পরিচিত একজন ওখানে যাবেন স্থির করেছেন। তিনি আমাদের পূজনীয়। সাধুসন্ন্যাসীর মতন মানুষ। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য মাঝে খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছেন। জল-হাওয়া বদলাতে তিনি যাবেন স্থির করেছেন। আমার বাড়িতেই থাকবেন। মাসখানেক কম করে। তিনি আগামী সপ্তাহে যেতে পারেন। সঙ্গে দু চারজন লোক থাকবে। ওঁর স্ত্রীও। তুমি আমাদের ঘরবাড়ি সাফসুতরোর ব্যবস্থা করো, মালীকে হাজির থাকতে বলো। পারলে এক জোড়া কাজের লোকের ব্যবস্থা করে রাখবে। তোমার চিঠি পেলেই আমি এঁদের যাবার ব্যবস্থা করব। তোমার ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমাদের আশীর্বাদ জেনো।

চিঠি পেয়ে বিলাস অখুশি হ'ল না।

সাধন মল্লিক বিলাসের অনেক দিনের চেনাজানা। উনি বরানগরে থাকেন। দু'পুরুষের ব্যবসা। গেঞ্জি কারখানার মালিক। হালে বছর দুয়েক কার্ডবোর্ডের ব্যবসাও শুরু করেছেন। পয়সাঅলা লোক। তবে দেমাক নেই। বিলাসকে পছন্দ করেন। মল্লিকদা এখানে এলে আসরটা ভালই বসে। ছোট আসর। দুই ভাই আর বিলাস। কলকাতা থেকে আসার সময় ভাল মদটদ আনেন। এখানে ওসব পাওয়া যায় না।

বিলাস বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। মল্লিকদাদের "ঊষাবীথি" মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। মালীও রয়েছে বাড়িতে। বিলাস দু-এক দিনের মধ্যে বাড়ি একেবারে সাফসুত করিয়ে দিতে পারবে।

অপেক্ষা করল না বিলাস। সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখে পকেটে রেখে দিল। বিকেলে একেবারে স্টেশনে গিয়ে আর. এম. এস-এ ফেলে দেবে।

সবই হ'ল। কিন্তু সেই স্বপ্ন! বিলাসের মাথায় যেন কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে স্বপ্নটা।

তিন

স্টেশনে চিঠি ফেলতে গিয়েছিল বিলাস।

আর. এম. এস-এর একটা ছোট গুমটি মতন আছে রেল প্লাটফর্মে। বাসে করে ডাকের যে ব্যাগগুলো আসে সারাদিন, সেগুলো জমা হয় গুমটিতে। তারপর রেলের ডাক-কামরায় চালান হয়ে যায়। এখানে চিঠিপত্র ফেললে খানিকটা সুবিধে, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে ঠিকানায়।

বিলাস তার চিঠিটা ফেলে দিয়ে চলে আসছিল, ওভারব্রিজের ওপর কিরীটের সঙ্গে দেখা। শীতের বেলা। পাঁচটা সওয়া পাঁচটাতেই অন্ধকার প্রায়।

"এই যে, তোকেই খুঁজছিলাম। কোথায় যাচ্ছিস?" বিলাস বলল।

"বীণাদির বাড়ি। কেন?"

"ওখানে তোর কতক্ষণ লাগবে?"

"তা জানি না। কেন ডেকেছে তাও বুঝতে পারছি না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরতে পারব। কেন, তুমি আমায় খুঁজছ কেন? কী দরকার?"

"কী দরকার—! সে-সে আছে। বলব বলেই তোকে খুঁজছি। ... আমি এখন হোটেলে যাচ্ছি। সেখানেই থাকব। তোর জন্যে ওয়েট করব।"

"সে কী! তাসে যাবে না?"

"না।" বিলাস মাথা নাড়ল। "তুই ঘুরে আয়। আমি থাকব।"

কিরীট চলে গেল। এখানকারই ছেলে সে। হাসপাতালের দিকে তাদের বাড়ি। বিধবা পিসি আর দুই ভাই। মা বাবা নেই। বাবা ছিলেন এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার। ছোট স্কুল। তখন মিডল ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হত। বেহারি বাঙালি মিলিয়ে মাত্র শ'-সওয়াশো ছাত্র। উঁচু ক্লাসগুলো পড়তে হ'ত শহরের জুবিলি স্কুলে গিয়ে। এখন অবশ্য উঁচু ক্লাস হয়েছে। তবে ছাত্র সেই শ দুই — সব মিলিয়ে। আর স্কুলও সেই রকম। লোকে ঠাট্টা করে বলে : গাদ্ধা হাই স্কুল।'

মাস্টারমশাই — কিরীটের বাবা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। মাথা গোঁজার জায়গা একটু করে ফেলেছিলেন তখন — সস্তা গণ্ডার বাজারে — তাই কিরীটদের

গাছতলায় বসতে হয়নি। মা মারা গিয়েছেন বছর চারক আগে। পিসি জাঁদরেল। তাঁর কিছু ছিল শ্বশুরবাড়ির তরফের। দাদার বাড়িতে বিধবা হয়ে ফিরে এসে পিসি একরকম হাল ধরেন সংসারের। ভাইপোদের মানুষও করেছেন পরে।

কিরীট একটা পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে পাস করেছিল। খুচরো দু'একটা চাকরির পর সে এখানকার ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি পেয়েছে। সবেই না কাজকর্ম শুরু একানে। লাইনও এসেছে স্টেশনের ও পাশে কিরীট ইলেকট্রিসিয়ান। তাদের অফিস বাজারের দিকে একটা ভাড়া বাড়িতে।

বয়েসে কিরীট অনেকটাই ছোট বিলাসের চেয়ে। বছর চৌত্রিশ বয়েস। বিলাসকে দাদা বলে, শিবানীকে বউদি। তবু কিরীট তার বন্ধু।

কিরীটের মাথা আছে। ও ঠিক বিলাসের নেশার আসরের সঙ্গী নয়, তবে দলের লোক। বিলাসের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভাল।

বিলাস রোজই বিকেলের পর একবার তার হোটেলে আসে। থাকে সন্ধে পর্যন্ত। তারপর কোনোদিন তাসের আড্ডায় ভিড়ে যায়, কোনোদিন ঘোষের বৈঠকে। তারপর বাড়ি।

আজও বিলাস হোটেলেই এসেছিল। সাইকেল রেখে একবার তদারকি সারল। রতুয়ার পানের দোকান থেকে সিগারেট নিল এক প্যাকেট। একটা ট্রেকার এসে দাঁড়াল মোড়ে। সন্ধের প্যাসেঞ্জারের যাত্রীতে ঠাসা' ট্রেন ধরবে ওরা। সবাই প্রায় দেহাতি।

হোটেলে ফিরতেই খবরের কাগজ পেয়ে গেল। এখানে বিকেলের দিকেই কাগজ আসে। আসে শেষ দুপুরের গাড়িতে। কাগজ পেতে পেতে বিকেল।

আলো জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছে দোকানে। গোটা চারেক লণ্ঠন আর একটা পেট্রম্যাক্স জ্বলে হোটেলে। সামনের জামগাছে অন্ধকার জমে গিয়েছে, অশ্বত্থতলা একেবারে কালো ঘুটঘুটে যেন। বড় নালার গন্ধ আসছে। কুয়াশা এখনও চোখে ধরা যাচ্ছে না।

নিজের জায়গায় বসে বিলাস চা তৈরি করতে বলল। তারপর কাগজ খুলল। ...নপুরের কাছাকাছি ভয়ংকর এক রেল অ্যাকসিডেন্ট, জনা তিরিশ লোক মারা ...য়েছে ষাট সত্তর জন আহত। দিল্লিতে বোমা ফাটিয়েছে কারা। তিন চারটে দোকানঘর পুড়ে ছাই, জখম কয়েকটা লোক। কলকাতায় বিশাল মিছিল হয়েছিল তার ছবি। দুটো বধূহত্যা, একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি।

বিলাসের চোখ ছিল, মন ছিল না।

চা দিয়ে গেল বাচ্চা ছেলেটা।

কাগজ রেখে দিল বিলাস। বাড়িতে গিয়ে পড়বে। সাধারণত তাই পড়ে। শিবানীরও অভ্যেস আছে কাগজ দেখার। শিবানী কিন্তু বুদ্ধিমতী। বইটইও পড়ে।

বিলাস একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। কাল, বা আজ সকালেও বলা যায়, দেখা স্বপ্নটা সে কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারছে না। বার বার ভেসে আসছে, আর সে কেমন ধন্ধে পড়ে যাচ্ছে। খারাপ লাগছে।

অথচ কত অদ্ভুত স্বপ্নই তো সে দেখে। এই তো ক'দিন আগেই স্বপ্ন দেখেছিল, একটা অন্ধ মেয়ে একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তার পিছনে কতকগুলো বাচ্চা। একেবারে উদোম ন্যাংটো, কেরাসিনের টিন আর ঢোলক বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার কুকুরও চলেছে সঙ্গে। অন্ধ মেয়েটা সোজা হেঁটেই যাচ্ছে, রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো থেকে পাতা পড়তে লাগল হঠাৎ, লাল পাতা, যেন সিঁদুর লেপা। দেখতে দেখতে লাল বৃষ্টি। রক্ত বৃষ্টি নাকি !

স্বপ্নে কি রং চেনা যায়! হয়ত চেনা যায় না চোখে, তবে অনুমান করা যায়।

মেয়েটাকে কারা যেন তুলে নিয়ে গেল হঠাৎ। কারা? কারা যে কে জানে!

"বিলাসদা?"

"কিরীট! আয়!"

"চোখ বুজে বসে কী ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম---! বলব তোকে। বলার জন্যেই আসতে বললাম। চা খা। পচুয়া, চা দে এখানে। ভাল করে বানাবি! ...তা তোর কাজ হ'ল?"

"হ্যাঁ, কাজ মানে — বীণাদি একটা চিঠি পেয়েছে। ইলেকট্রিক কানেকশান পাবে। টাকা জমা দিতে বলেছে। বলছিল, অনেক টাকা। যদি কমানো যায়!"

"আমার হোটেলে লাইন আনবি না।"

"এ দিকে সব একসঙ্গে হবে। ছ'মাস।"

"শর্মা বলছিল, জলদি হয়ে যাবে।"

"ও ওই রকমই বলে।"

"নে, সিগারেট খা।"

কিরীট সিগারেট নিল। সে বড় একটা সিগারেট খায় না। পান জরদার নেশা আছে।

"ব্যাপার কী বলো?"

"বলছি। চা আসুক। মুখে দে।"

"আসবে। তুমি বলো। পিসি একটা মেয়ে ধরেছে, লটকিবাঁকের, ফোটো এনেছে। বলছে, বিয়ে কর। আমি বলেছি, ওটা মেয়ে না মাসি। বিয়ে টিয়ে হবে না, বিয়ে আমি করব না। আমার কোষ্ঠিতে আছে, বিয়ে করলেই বউ মারা যাবে। অন্যকে মেরে কী লাভ! নারীহত্যা!"

বিলাস হেসে ফেলল। "ভাগ্যবানের বউ মরে। আবার করবি!"

"সে গুড়ে বালি, দাদা। আবার করলে আবার মরবে। তিন নম্বর লাগালে সেও ফট।"

জোরে হেসে উঠল বিলাস। আজ সারাদিনে এই বোধহয় তার গলা চড়িয়ে হাসা।

"তোমার জরুরি ব্যাপারটা বলো," কিরীট বলল, "চায়ের জন্যে বসে থেকো না। বীণাদির বাড়িতেও চা খেয়েছি।"

বিলাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাল একটা এমন বাজে স্বপ্ন দেখেছি।"

"আবার স্বপ্ন!"

"এটা যেমন অদ্ভুত তেমনই ভয়ংকর।"

"ও তো তুমি দেখোই, দাদা! নতুন আর কী!" কিরীট বলল। রাস্তা থেকে গর্জন শোনা গেল, একটা বাস এল ডিপোয়। গিরিডির বাস বোধহয়, তিন ঘাটের কাদা মেখে আসে, মানে ধুলো। হাতের সিগারেট ফেলে দিল কিরীট, ছুড়েই ফেলল বাইরে। "তুমি ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে পার না! ঝপ ঝপ করে নোট পড়ছে গাছ থেকে, বাস ভর্তি সোনার বিস্কুট পেয়ে গেলে, তোমায় রাজা মহারাজারা খানা খাওয়াচ্ছে। হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছ!"

"কিরীট ! ইয়ার্কি মারবি না।"

"না। আমার কথা হচ্ছে, স্বপ্নই যদি দেখবে, তবে ঘুঁটে পোড়ার স্বপ্ন দেখবে কেন! সোনার স্বপ্ন দেখবে। গাছে ফলে সোনা, মানে হীরে মুক্তো ঝুলছে, চাঁদের আলোয় পরী উড়ছে!"

"রূপকথা!"

"ওই আর কী।....তবে রূপকথার দিন এখনও একেবারে শেষ হয়নি। ফর্ম পালটে গিয়েছে। কোটি কোটি টাকা এখনও ওড়ে, সোনা চাঁদি হীরে...."

বিলাস ধমক মেরে থামিয়ে দিল কিরীটকে। চা এসে গিয়েছিল ততক্ষণে।

চায়ে চুমুক দিল কিরীট।

হোটেলে লণ্ঠনগুলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে। পেট্রম্যাক্স জ্বালাবার তোড়জোড় করছে রাম।

"বলো, তোমার স্বপ্ন।"

বিলাস বলতে লাগল। যতটা পারে স্পষ্ট, নিখুঁত করে বলতে গিয়ে তার গলা কখনও গভীর, কখনও আবেগপূর্ণ, আবার ভীতার্ত হয়ে উঠছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, বিলাসের মন থেকে স্বপ্নের গভীর আঁচড়গুলি এখনও শুকোয়নি।

বাইরে এ বার কুয়াশা নামল। অন্ধকার আরও ঘন। রাস্তায় লোকজন কমে আসছে। জামগাছের তলায় কয়েকটা জোনাকি উড়ছিল।

কিরীট অবাক হয়ে শুনছিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে যতটা তার চেয়েও বেশি বিলাসদার উত্তেজনা আর বিহ্বলতা দেখে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

বিলাস যেন অপেক্ষা করে ছিল, কিরীটের কাছে কিছু শুনবে বলে।

কিরীট শেষ পর্যন্ত বলল, "দাদা, স্বপ্ন স্বপ্নই। ভুলে যাও।"

"ভুলে যাব! পারছি কই!"

"পারবে। তুমি প্রায়ই যত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ, সব কি মনে রাখ! সময়ে ভুলে যাও।"

"কিন্তু এমন হয় কেন?"

"তোমার ধাত। ডাক্তাররা বলতে পারে।"

"ডঙ্কা পারে। আমায় একজন বলেছিল, আপনি নানা রকম উদ্বেগে ভোগেন। বলল, টেনশান। কিস্যু ভাববেন না। গ্রাহ্য করবেন না। খাবেন দাবেন ঘুমোবেন। কাজ যা করার করবেন। স্ত্রীর সঙ্গে মাখামাখি করবেন। আপনার বয়েস এমন কিছু বেশি নয়। ইজি লাইফ কাটাবেন, মশাই। জীবনে যা হবে — হবে। ভগবান যেমন ভেবে রেখেছেন — তাই হবে। ঘাবড়াবেন না। ....আর আপাতত, একটা ভিটামিন খান রোজ, শোবার আগে ঘুমের ওষুধ একটা। অন্তত মাসখানেক।"

"মন্দ কী বলেছে!"

"ধ্যুত, শালা! আমি ভিটামিন খাব! কেন? আমার খাওয়া-দাওয়া ঠিক আছে। সব খাই, শাকপাতা উচ্ছে কচু, মাছ পেলে মাছ, ডিম....। রোজ ক মাইল সাইকেল চালাই, জানিস!"

"ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলে?"

"হপ্তা খানেক। বোগাস। ওর চেয়ে আমার ইয়ে ভাল। ভেতরে করালী কালী নাচে।"

"কাল তুমি তাসের আড্ডায় মাল খেয়েছিলে?" বলতে বলতে কিরীট আরও একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাল।

মাথা নাড়ল বিলাস। "না। কাল তাসের আড্ডায় যাইনি। পেটে এক ফোঁটাও পড়েনি। কাল হোটেলেই ছিলাম রাত আটটা পর্যন্ত। খদ্দের এসে গেল দশ বারো জন। চেঞ্জার। তাদের জন্যে রাত্তিরের খাবার তৈরি করিয়ে দিতে হ'ল।"

"এক কাজ করো।"

"কী?"

"সকাল রাত্তির একটু জপতপ করো। ভগবানের নাম নাও। মাঝে মাঝে বাড়িতে সত্যনারায়ণ করো।"

বিলাস বিরক্ত হ'ল। "তুই আবার আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস! জানিস, তোর

বউদি আজ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

"তুমি যদি ভয় পাওয়াও তবে বউদির দোষ কোথায়! যাক গে, কাল আমি যাব একবার বউদির কাছে। আজ চলি!"

"যাবি!"

"কাল তুমি কখন বাড়ি থাকবে?"

"কাল আমি ভীষণ ব্যস্ত। সাধনবাবু চিঠি দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি পরিষ্কার করিয়ে রাখতে হবে। মালীবেটাকে পেয়ে যাব। কিন্তু গোটা দুয়েক কাজের লোক কোথায় পাব কে জানে। দেখি।"

কিরীট উঠে দাঁড়াল। "সাধন মল্লিকরা আসছে নাকি ?"

"না, ওঁবা আসবেন না। ওঁদের লোক আসবে। মামুলি লোক নয়, খাতিরের লোক। সাধুসজ্জন, তাঁর স্ত্রী, দু'একজন চেলাও হয়ত।"

"সাধু! বাবাজি!"

"জানি না।" সাধু বলে লেখেননি মল্লিকমশাই। লিখেছেন, সাধুসজ্জন প্রকৃতির মানুষ। না দেখে কেমন করে বুঝব তিনি সাধু কি না!"

"সাধু! স্ত্রী সমেত।"

"গৃহী সাধু হয় না! তুই কি কিছুই জানিস না! সাধু হলে স্ত্রী থাকে না! রামকৃষ্ণ ঠাকুর আর মা সারদা ছিলেন না!"

কিরীট মাথা দোলালো। তার ভুল হয়েছে। বলল, "চলি দাদা। আমার অন্য একটু কাজ আছে। তুমিও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেয়ো। বউদি একা আছে। ভয় পেয়েছে বউদি বলছিলে!"

"একা ঠিক নেই। কাজের মেয়েটা আছে। গঙ্গা।"

"তা থাক। তুমি দেরি করো না। তাসের আড্ডায় ভিড়ে যাবে না। চলি।" কিরীট চলে গেল।

বিলাস বসে থাকল অন্যমনস্কভাবে। হোটেলের পেট্রম্যাক্স জ্বলে উঠেছিল। আলো ছড়াচ্ছিল অন্ধকারে।

চার

দশ দিনের মাথায় সাধন মল্লিকদের 'উষাবীথি'তে তাঁর অতিথি এসে পৌঁছে গেল।

বিলাসের সঙ্গে মল্লিকমশাইয়ের আরেক দফা চিঠি লেখালেখি হয়ে গিয়েছিল। তাতে দায়-দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল তার। যাঁরা আসছেন তাঁদের স্টেশনে নামিয়ে নেওয়া, বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, গোড়ার দিকে সব ঝক্কিঝামেলা সামাল দেওয়া থেকে আরও ছোটখাট অনেক কাজ।

'উষাবীথি' বাড়িটা স্টেশন থেকে অন্তত মাইলখানেক। এখানকার পথঘাটও পিচ বাঁধানো নয়, মানে স্টেশন থেকে থানা ধরে যে বাস রাস্তা চলে গিয়েছে সদর শহর পর্যন্ত, সেই বড় রাস্তাই যা পিচ বাঁধানো, বাবুদের ঘরবাড়ির দিকগুলো নয়। সেগুলো পাথর ভাঙা টুকরো আর মাটি দিয়ে বাঁধানো। ফলে উঁচু নিচু, খানাখন্দ, গর্ত পায়ে পায়ে। সাধারণ লোকের পক্ষে অসুবিধে হয় না বড়, তাদের জন্যে মাঠ ময়দানও আছে, কিন্তু বয়স্ক মানুষের পক্ষে এই রাস্তায় হাঁটা কষ্টকর।

মল্লিকমশাইয়ের চিঠি থেকে সেটা আগেই জেনেছিল বিলাস। ব্যবস্থাও করেছিল। তুলসীরামের ট্রেকার রেখেছিল স্টেশনে।

গাড়ি এল চারঘণ্টা দেরিতে। বিকেল তিনটের গাড়ি, এসে পৌঁছল সন্ধের শেষে, যখন প্রায় রাত হতে চলেছে। শীতের বেলায় পাঁচটা মানেই প্রায় সন্ধে। আর এখন তো অগ্রহায়ণও শেষ হয়ে এল। দিন দিন রাত আসছে বড় বড় পা ফেলে যেন, শীতও।

প্ল্যাটফর্মে যাঁদের খোঁজাখুঁজি করে নামিয়ে নিল বিলাস তাঁদের দেখে সে বেশ অবাক। নামল চারজন। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পুরোপুরি বৃদ্ধ বলা যাবে না, আবার সদ্য প্রৌঢ়ও নয়। দেখলে বছর পঁয়ষট্টি বলে মনে হয়। বিলাস ভেবেছিল সে বোধহয় কোনও সাধু সন্ন্যাসী গোছের কাউকে দেখবে। মোটেই তা নয়। পরনে গরম প্যান্ট, গায়ে গলাবন্ধ লম্বা কোট, গলায় মাফলার, হাতে মোটা ছড়ি। মাথায় ভাঁজ টুপি। গড়ন লম্বা। শান্ত মুখ। চোখের চশমা বুক পকেটে উঁকি দিচ্ছিল। নাম, গিরিজাশঙ্কর দত্তচৌধুরী।

বিলাস নিজে তাড়াহুড়ো করছিল অতিথিদের নামানোর সময়। লক্ষ করল, ভদ্রলোকের তেমন ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্থে নামলেন নিজে। স্ত্রীকে ঠিক সাহায্য করতে পারলেন না, তবু পাদানির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে নামালেন তাঁকে। মহিলা খানিকটা আড়ষ্ট। লাল পাড় শাড়ি, গায়ে শাল, মাথায় সামান্য কাপড়, ধবধবে সাদা চুল মাথার, চোখে ভারী কাচের চশমা। হাতে একটা বটুয়া ধরনের ব্যাগ।

মালপত্র নিয়ে নামল আরও দুজন। একজন বোধহয় তদারকি করে ভদ্রলোকদের।

অন্যজন একটি মাঝ যুবতী মেয়ে। ছিপছিপে চেহারা। কালচে রং গায়ের। নাক মুখ বসা ধরনের।

বিলাস এখানেও বোকা বনে গেল। মল্লিকমশাইয়ের চিঠি পেয়ে সে মনে মনে আন্দাজ করেছিল, দু'চারজন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে কোন সাধুজি, অন্তত চেহারায় বেশভূষায় সাধু-সাধু ভাবের কেউ আসবেন। না তেমন কেউ আসেননি। বিলাসের বুঝতে ভুল হয়েছে, মল্লিকদার চিঠিতে সাধুসজ্জন কথাটা অবশ্যই ছিল, তবে সাধুসন্ন্যাসী বাবাজি বলে কিছু ছিল না। বিলাস বোধহয় বেশি বেশি ভেবে নিয়েছিল।

মালপত্র একেবারে কম নয়। শীতের দিনে আসা, তায় বুড়োবুড়ি, থাকবেনও মাসখানেকের ওপর, গোছগাছ পুঁটলি তো হবেই।

মুটে মজুর জুটিয়ে ওভারব্রিজে উঠে এ পারে আসা।

ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে উঠলেন। ওঁর একটা পায়ে বোধ হয় জোর কম। বুড়ির আবার চোখের নজর বেশ কম।

তুলসীরাম লোকটা ভাল। বিলাসকে খাতিরও করে। বিকেলের পুরো ট্রিপ নষ্ট করে সে বসে আছে গাড়ি নিয়ে দুপুর থেকে। তবু বিরক্ত হয়নি।

ট্রেকারে মালপত্র তুলে 'উষাবীথি'।

দু-চারটে কথাবার্তা আগে হয়েছিল। গাড়িতে বসে আরও কিছু কথাবার্তা।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, "ট্রেনটা বেশ লেট করল। তোমার অসুবিধেই হল, কী বলো?"

"আজ্ঞে না। আমার আর অসুবিধে কী! আমি তো কাছেই থাকি। আমার হোটেলও সামনে। আমি এ সময় এখানেই থাকি।"

"তোমার নাম শ্রীবিলাস। কত বয়েস হল?"

"চল্লিশ পার করেছি।"

"ও! চ-ল্লিশ! চল্লিশে শুরু হয়। আমার সাতষট্টি। ওঁর যাট।" বলে স্ত্রীকে দেখালেন ঘাড় ফিরিয়ে।

বিলাস বুঝতে পারল না, চল্লিশে শুরু হয় মানেটা কী? জিজ্ঞেসও করল না। এ নিয়ে কথা বলার সময় এখন নয়।

"পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হবে," বিলাস বলল।

"চার ঘণ্টা পথে দাঁড়ালাম, পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে পারব না!"

"আজ্ঞে সে রকম কিছু নয়। আমার হোটেল থেকে সামান্য রুটি ভাজি নিয়ে আসব আপনাদের জন্যে। বলা আছে। তৈরিও আছে। এতটা রাত্তিরে বাড়ি গিয়ে অন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় আপনাদের।"

"এই দ্যাখো! ব্যবস্থা করার কী ছিল! দুধ পাউরুটি হলেই হাঙ্গামা চুকে যেত। দু

পাঁচটে মিষ্টি আমাদের সঙ্গেও আছে। তা ছাড়া রাত্তিরে আমি দুধ আর একটা মিষ্টি ছাড়া কিছু খাই না। উনি অবশ্য খই, সাবু, এক আধ টুকরো ফল পেলেও খান। ...তা যাক গে, ওরা রয়েছে — বদু আর কানন — তোমার রুটি তরকারি ফেলা যাবে না।"

ট্রেকার দাঁড়াল।

বিলাস ছুটল হোটেলে।

ফিরে এল একটু পরেই। শালপাতায় মোড়া খাবার, আর একটা ছোট মাটির হাঁড়ি।

ট্রেকার আবার চলতে শুরু করল।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, "সাধন তোমার খুব প্রশংসা করছিল। বলছিল, যার ভরসায় আপনাদের পাঠাচ্ছি তার চেয়ে যোগ্য লোক আর নেই। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।"

বিলাস যেন লজ্জা পেয়েছে, বলল, "মল্লিকদা আমার অনেক দিনের চেনাজানা। দুই ভাই-ই। স্নেহ করেন।"

"তোমার কথা আমি সাধনের মুখে শুনেছি। তুমি তো আরও ক'টা বাড়ি দেখাশোনা কর! তাই না?"

"করি। আছে দু'চারটে। সকলেই বাঙালি। ওঁরা বলেছেন, একটু খোঁজখবর রাখতে, সেইভাবেই রাখি।"

সামান্য চুপচাপ। দু পাশে ঘন গাছপালা, বড় ছোট; মাঝে মাঝে এলোমেলো বাড়ি। একতলা। কোনটাই সে ভাবে পাকা নয়। আলো নেই রাস্তায়। এখানে আলো হয়নি এখনও। হবে। ধুলোর গন্ধ। কুয়াশা। শীতের হাওয়া গায়ে লাগছিল।

"এখানে ভালই শীত নামছে," গিরিজাশঙ্কর বললেন।

"পৌষ এসে গেল।"

"শীত আমার ভাল লাগে। আমি একসময় মিরাটে ছিলাম। ....বিলাস, তোমার বাড়ি!"

"কেশব পল্লী। ওই দিকে— রেল লাইনের গায়ে।"

"কে কে আছে?"

"আমার স্ত্রী, শিবানী। আমরা দু'জন। আর একটা মেয়ে থাকে আমাদের কাছে।"

ট্রেকার বার কয়েক ঝাঁকি খেল। আলোয় বিশেষ জোর নেই। রাস্তার পাশে শীত জড়ানো ভিজে-ভিজে পাতা। মাঠঘাটের গাছপালার গন্ধ।

গিরিজাশঙ্কর আচমকা বললেন, "তুমি এখানে কত কাল আছ?"

প্রশ্নটা কি উনি আগে একবার করেছিলেন? বিলাস ভাবল, মনে করতে পারল না। বলল, "অনেক দিন। প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল।"

"তবে তো তোমার জানা আছে সব।"

"তা আছে। এখানে জানার আর কী আছে বলুন। ক'টা বাড়ি, জঙ্গল, একটা ছোট আশ্রম, হনুমান মন্দির, আমাদের দুর্গাবাড়ি।"

"একটা গুহা নেই?"

"গুহা! গুহা এখানে? বিলাস অবাক। ভীষণ অবাক। গিরিজাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"নেই?" গিরিজাশঙ্কর বললেন, "থাকার কথা। আমি শুনেছিলাম....।"

বিলাস মাথা নাড়ল। "আজ্ঞে, আমরা তো শুনিনি। এখানে কাছাকাছি কোনও পাহাড় নেই। পাহাড়ের ঢল আছে। নদী আছে। তাও বর্ষা ছাড়া জল থাকে না। পাহাড় না থাকলে গুহা থাকবে কেমন করে!"

গিরিজাশঙ্কর আর কিছু বললেন না।

পিছনের সিটে অন্যরা মাঝে মাঝে নিচু গলায় কথা বলছিল। শোনা যায় না। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মালপত্র সামলাচ্ছে বদ্যিনাথ—বদু। কানন বুড়িকে আগলে রেখেছে।

বিলাস হিন্দিতে তুলসীরামকে গুহার কথা জিজ্ঞেস করল। তুলসীরাম জবাব দিল, সে জানে না।

শেষ পথটুকু চুপচাপ। 'উষাবীথি' পৌঁছে গেল ট্রেকার।

বড় বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় রাখা টুলের ওপর বাতি জ্বলছিল। ছোট পেট্রম্যাক্স। মালী জ্বালিয়ে রেখেছে।

কাঠের ফটক খুলে দিল মালী।

ট্রেকার এসে বারান্দার কোল ঘেঁষে দাঁড়াতেই পিছন থেকে মহিলা বললেন, গলা প্রায় শোনাই যায় না। "এসে গিয়েছি?"

বিলাস এই প্রথম স্পষ্ট করে বুড়ির গলা শুনল। শুনে মনে হল, এমন নরম ধীর গলা সে বড় একটা শোনেনি। কানে লেগে থাকল গলার স্বর।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, "এলাম তো। ....সাবধানে নামবে।"

ওরা নামতে লাগল, বদ্যিনাথ কানন। তারপর বৃদ্ধা।

বিলাসরাও নেমে পড়েছিল।

পাঁচ

অন্য দিনের চেয়ে আজ সকালে বিলাসের একটু তাড়া ছিল।

সকালের রোদ বারান্দায় এসেছে। কাঠের চেয়ারে বসে বিলাস জলখাবার খাচ্ছিল। গোল একটা হালকা টেবিল সামনে। ভেতর বারান্দার সামনে খানিকটা বাঁধানো, বাকিটা মাটি। গাঁদা গাছের মাথাগুলো বড় হয়েছে বেশ। এখনও কুঁড়ি ধরেনি। রঙ্গন ঝোপ লালে লাল। শালিখ নামছে উঠোনে। রোদ চমৎকার। এখনও কাঁচা। বেলায় তেতে উঠবে।

গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটা আর নিজেদের ছোট সব্‌জিবাগানের কচি বেগুন ভাজা খাচ্ছিল বিলাস। মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

শিবানী এসে বলল, "আর একটা পরোটা দেব?"

"না! তিনটে খেয়ে ফেলেছি।"

"ফিরতে ফিরতে সেই দুপুর; তারপর স্নান-খাওয়া।"

"না খাটলে খাব কী?"

"আজ তোমার বেশি তাড়া।"

"বললাম যে, আগে 'উষাবীথি' যাব। কাল বুড়োবুড়িকে তুলে দিয়ে এসেছি মাত্র। আজ গিয়ে দেখতে হবে, নতুন জায়গায় রাত কেমন কাটল। তারপর ওঁদের কী কী দরকার দেখতে হবে। চাল ডাল তেল হাট-বাজার। একটাকে লাগিয়ে দিয়েছি কালই, মালী আছে। ওদেরও লোক আছে সঙ্গে দু'জন। তবু সকালেই একটা খোঁজখবর নেওয়া দরকার।"

শিবানী কাল রাত্রেই স্বামীর কাছে বুড়োবুড়ির কথা শুনেছে। চোখে দেখার কথাই ওঠে না, তবু অন্যের মুখে শুনলেও তো একটা ছবি আন্দাজ হয়। শিবানীরও হচ্ছিল। শুনে ভালই লাগছিল বুড়োবুড়িকে।

"আমায় কবে নিয়ে যাবে?" শিবানী বলল।

"যাবে। তাড়াতাড়ি কিসের! সবেই তো কাল এসেছেন।"

"কতদিন থাকবেন?"

"মাসখানেকের বেশি তো বটেই। দেড় দু'মাসও হতে পারে।"

শিবানীর হাতেও চায়ের গ্লাস ছিল। সে এই ভাবেই চা খেতে ভালবাসে। শীতের দিনে আরও যেন আরাম এতে। সকালের বাসী শাড়ি জামা ছেড়েছে শিবানী। এখন গায়ে সাধারণ শাড়ি। ছাপা। গায়ে জামার ওপর হাতকাটা সোয়েটার। শিবানীর আজকাল অল্পতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। বুকে শ্লেষ্মা জমে। হাঁফের মতনও হয়। এখনকার ঘোষাল ডাক্তার সাবধানে থাকতে বলেছে। শীতের প্রথম ধাক্কাটা কাটাতে

পারলে ভালই থাকবে। শিবানীর চোখমুখ সামান্য ফুলে আছে এখন। হয়ত বাসী চোখমুখ বলে। বা শরীর একটু খারাপ বলে। দু'দিনেই কেটে যাবে। তাকে দেখতে আহামরি নয়, চলনসই গড়ন, তবে মুখের ছাঁদে শ্রী আছে, গলা লম্বা, বুক ভারী।

বিলাস উঠে পড়ল।

শিবানী বলল, "সংসারে যদি কিছু দরকার লাগে জেনে নেবে।"

"কী লাগবে! হাতা খুন্তি চিমটে।" বিলাস ঠাট্টা করে বলল, হাসতে হাসতে। তারপর চোখ টিপে বলল, "চিমটেটি আমার ভাই। কাউকে দিতে পারব না।"

শিবানীর বড় একটা অভ্যেস নেই জিব বার করে 'ইস' বলার। এখন বলে ফেলল।

সাইকেলে যাবার অনেক সুবিধে। মাঠ ভেঙে, বড় পুকুরের গা দিয়ে ঝপ করে চলে যাওয়া যায়। হাঁটা পথেও রাস্তা বাঁচিয়ে যেতে, 'উষাবীথি' যেতে বড় জোর পনেরো বিশ মিনিট।

বিলাস দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছিল। রোদ আরও ঘন হয়ে এল। মাঠের ঘাসে, আগাছায়, কচি পলাশ ঝোপে সারারাতের হিম। পাখি উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে ঝাঁক বেঁধে, তাদের কাকলি কদাচিৎ, ট্রেন যাচ্ছে লাইনে, বাঃ খাসা সকাল।

যেতে যেতে হঠাৎ কালকের একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'এখানে গুহা আছে?'

'গুহা! গুহা এখানে! পাহাড়ই নেই তো গুহা......'

সত্যি এখানে গুহা কোথায়? গিরিজাশঙ্কর গুহার কথা বললেন কেন? কার কাছে শুনেছেন তিনি! বিলাস এখানে যখন এসেছিল, হাজরাবাবার কাছে, তখন তার বয়েস কত! কুড়ি একুশ। আজ চল্লিশ। এত বছরে সে একবারও গুহার কথা শোনেনি। কারুর মুখে নয়। অথচ এই জায়গাটা তো বিলাসের চষে বেড়ানো। কী না জানে! এখানের এককালের মস্ত জমিদার নবাব সিংয়ের একটা বিরাট কাছারি বাড়ি ছিল, পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরি। দুর্গ যেন। নবাব সিং সেখানে কাউকে পুড়িয়ে মারলেও কেউ জানতে পারত না। সেই কাছারিবাড়ি আজ মাটির তলায়। তার কোনও অস্তিত্ব নেই। উই ঢিবি, ফণিমনসা, বয়ড়া গাছ ভর্তি জায়গাটা।

গুহা। না, কোনও গুহা নেই।

গিরিজাশঙ্কর যদি শুনেও থাকেন, ভুল শুনেছেন।

তবু, বিলাস ভাবল, হোটেলে যারা গল্পগুজব করতে আসে, কিংবা অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখবে। তারা যে ওর চেয়ে বেশি কিছু জানবে এমন নয়, তবু —।

এ দিককার বাড়িগুলো একেবারে ফাঁকা নয়। বারো কি চোদ্দটা বাড়ি, ছোট বড়, মোটামুটি মিল আছে ছাঁদে। বেশির ভাগই ফাঁকা এখন। পুজোর সময় ভর্তি ছিল,

তারপর ছুটি কাটিয়ে চলে গিয়েছে। আবার এখন আসতে শুরু করবে। স্থায়ী বাসিন্দে তিন ঘর। পুরনো স্টেশন মাস্টারমশাই জগদীশ মুখুজ্যে, বাবুরাম মিশ্র, আর মণিকা মাসিমা।

কাউকে কাউকে দেখল বিলাস। রাস্তা থেকে হেসে কথা বলল, দু'একটা। শেষে সেই 'উষাবীথি'।

গিরিজাশঙ্কর বারান্দার নীচে পায়চারি করছিলেন। ফ্লানেল বা কটস উলের পাজামা, পায়ে মোজা, চটি। গায়ে সোয়েটার, পুরো হাতা, তার ওপর শাল, হাতে লাঠি। পাথরের নুড়ি বিছানো জায়গাটুকুতে হাঁটছেন ধীরে ধীরে। বারান্দার ধার ঘেঁষে একটা চেয়ার। বৃদ্ধা বসে আছেন। গায়ে শাল। মাথার কাপড় ঘাড় পর্যন্ত। পুরো মাথা সাদা। চোখের চশমার কাচ এত পুরু যে চোখ দেখা যাচ্ছে না। রোদ পোয়াচ্ছেন।

বিলাস সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

"কাল কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ঘুম হয়েছিল?"

"এসো। ... না, ঘুমটা ভাল হয়নি। নতুন জায়গা। প্রথম দিন। ঘুমের ওষুধটাও খাওয়া হয়নি কাল। ভেবেছিলাম, এ লং জার্নি মে হেল্প। ও কিছু নয়।"

"আমি একবার খবর নিতে এলাম। এখান থেকে হোটেলে যাব আমার। ভাবলাম আপনাদের নিশ্চয় হাট-বাজারের দরকার পড়বে।"

"তা পড়বে। তুমি রমার কাছে যাও। সংসারের ফর্দ ও বলতে পারবে।" বলে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন।

বিলাস বৃদ্ধার কাছে এল। দাঁড়াল সামনে। ভদ্রলোকের তুলনায় এঁর বয়েস কম, অনেকটাই কম, কাল বিলাস সেই রকমই শুনেছিল, অথচ এঁকে অনেক বেশি প্রৌঢ়া দেখায়, বৃদ্ধাই মনে হয়। জড়সড় ভাব। খানিকটা অগোছালো। তবে ছোটখাট ফরসা রঙের গোলগাল মুখের মহিলাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, শীতের রোদে উনি যেন এক সুষমা নিয়ে বসে আছেন।

কথা বলল বিলাস. কেমন আছেন, কেমন লাগছে, রাত্রে কোনও অসুবিধে হয়েছিল কি না! শীতটা কি বেশি লাগছে?

জবাব দিলেন রমা। ধীরে ধীরে। গলার স্বর পাতলা, ঘন, সুন্দর।

"আপনাদের তো বাজার-টাজার লাগবে। আমি ভাবলাম জেনে যাই। যাচ্ছি বাজারেই। যা লাগবে...."

"তা লাগবে। কানন সব জানে। বলছিল। তুমি বাবা একটু দাঁড়াও, আমি কাননকে ডাকি।"

"ওঁর গলার স্বর ভেতরে কানন পর্যন্ত পৌঁছল না। বিলাসই আশপাশ তাকিয়ে

ভরতুকে দেখতে পেল। ভরতুকেই দিয়েছে বিলাস এ বাড়িতে কাজের জন্যে। ডাকল তাকে।

কাননকে ডেকে আনল ভরতু।

"তুই সকালে কী কী আনবার কথা বলছিলি?" রমা বললেন।

"অ-নেক। চাল ডাল তেল মশলা শাক-সব্‌জি।"

"ফর্দ করেছিস?"

"বদুদাকে বলেছি।"

"কোথায় সে?"

বিলাস বলল, "এক কাজ করুন। আমি চলে যাই। আপনি বদুকে বলুন মালীকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে হোটেলে চলে যাবে। যা দরকার নিয়ে আসবে দু'জনে। বাজার স্টেশনের গায়েই। আমি কিনেকেটে দেব।"

রমা মাথা নাড়লেন। সেটাই ভাল। "তোমায় জ্বালাতন হতে হচ্ছে!"

"না না, সে কী! এ তো আমার কর্তব্য। সাধনদা বার বার লিখেছেন....।"

"আমরা আবার কেমন জান? বসতে পেলে শুতে চাই। তোমায় পেয়ে সবেই শুরু করলাম, শেষ যে কোথায় করব, কে জানে বাবা! তা বুড়ি মাসিমার জন্যে ঝঞ্ঝাট কিছু সইতেই হবে।" বলে উনি হাসলেন।

বিলাস হেসে বলল, "ঝঞ্ঝাট আর কোথায়! সামান্য কাজ। আমি এখন চলি।"

"তোমার বাড়ি কতদূর?"

"তা একটু দূর। আমরা শর্টকাট করি। তাতে অনেকটা কম হয় পথ।"

"আমি তো অত হাঁটতে পারব না। উনিও পারবেন না। ওঁর পা ভেঙেছিল। আবার মাস কয় আগে হার্টের অসুখ করল। তবু উনি কেমন সামলাতে পারলেন। আমি হলে পারতাম না। ওঁর বরাবরই মনের জোর বেশি। কাজকর্মও করতেন বড়। দায়িত্ব ছিল একরাশ।" কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চুপচাপ। তারপর খেয়াল হল। বললেন, "তুমি কিন্তু বউমাকে নিয়ে আসবে তাড়াতাড়ি।"

বিলাস হাসিমুখে বলল, "আপনি কেন বলবেন! ও আসবে। আমি চলি।"

ফেরার মুখে গিরিজাশঙ্কর বললেন, "বাড়িটা ভাল। সাধনের বাবা আমার রিলেশান হত। ও থাকতে অনেকবার বলেছে আসতে, আসা হয়নি।"

"আপনি সাধনদার কাকা হন সম্পর্কে!"

"হ্যাঁ। ... তুমি আবার কখন আসবে এ দিকে?"

"দেখি। এখন আমি হোটেলে যাব। দুপুরে বাড়ি। বিকেলে আবার হোটেল। ফিরতে ফিরতে আটটা তো বেজে যায়ই। ঠিক নেই।"

"সময় মতন এসো।"

বিলাস ফটক খুলে বাইরে। সাইকেলের চেইন আলগা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করে নিয়ে উঠে পড়ল সাইকেলে।

হোটেলে ভিড় নেই। ভিড় হয় এগারোটা নাগাদ। একটা বাস আসে চার জায়গা ছুঁয়ে, বড় বড় গঞ্জ, লোক ওঠে। এখানে এসে নামে। দুটো নাগাদ ট্রেন আছে আপ লাইনে। ট্রেন ধরতে আসে সব।

হাতে অনেকটা সময়। সাত আট দশজন যাত্রী বসে পড়ে হোটেলে ভাত খেতে। দু-একজন শুকনো রুটি ভাজি। তখন ভিড় থাকে। তারপর হালকা। বিকেলে বেশির ভাগই চা ডালপুরির খদ্দের। রাত্রে কয়েকজন খায়। বাসের যাত্রী থাকলে লোক বাড়ে খাবার।

বিলাস চা সিগারেট খেতে খেতে কুঞ্জকে টাকাপয়সা দিচ্ছিল তার ফর্দ মতন, রান্নাবান্না শুরু হয়ে গিয়েছে। গন্ধ আসছিল। বাইরে দুটো কুকুর কামড়াকামড়ি করছে, রুইতন মাছঅলা এক মাছ নিয়ে এসেছে। বলছে ঝুমুর তলাওয়ের মাছ। পুকুরের মাছ।

বিলাস মাছটা দেখল। রুই মাছ। এখনও চকচক করছে।

নিয়ে নিল বিলাস।

টাকা এখন নিল না রুইতন। ও বেলায় এসে নেবে।

হঠাৎ খেয়াল হল বিলাসের। রুইতনকে বলল, "উষাবীথি মালুম হায় না! আরে সাড়োয়া লটুয়া গাঁওকে ... হাঁ.. হাঁ..! শুন, ওহি কোঠিমে কুছ মছলি দে দিবি। থোড়া কুছ! ফির রোজ। না মিলি তো না দিবি!"

রুইতন মাথা নেড়ে চলে গেল।

রুইতন যেতে না যেতেই বদ্যিনাথ আর মালী একটা ঝুড়ি গোটা দুয়েক চটের থলি নিয়ে হাজির।

বদ্যিনাথ ফর্দ আর শ'টাকার দু-তিনটে নোট এগিয়ে দিল।

উঠে পড়ল বিলাস। বলল, চলো আগে লখিয়ার মুদির দোকানে যাই। ফর্দটা বলে বাজার সেরে দেব।

বিকেলে আবার হোটেল।

অন্ধকার হতে না হতেই রেলের মালগুদোমের নিরাপদ এসে হাজির। তাসের আড্ডায় টেনে নিয়ে যাবে। তাদের আড্ডাটা বসে অভয়বাবুর দরজির দোকানের পেছনে, চালাঘরে।

তাস যত চলে নেশাও চলে তত। দিশি মদ তবে ধেনো নয়, দিশি কোম্পানির

মাঝেসাঝে মুখ পালটাতে পল্লুয়ার দোকানের কড়া দিশি।

তাস খেলতে খেলতে বিলাস গুহার কথাটা তুলল। শোনামাত্র নিরাপদ মাথা নাড়ল। রেলের চাকরি করতে করতে বদলি হয়ে এখানে এসেছে, মাত্র তিন বছর। সে জানে না। ভৌমিকও নয়। প্রসাদ সিনহা পুরনো লোক, সেও বলতে পারল না। তুলসীবাবুও নয়।

"কী হবে হে গুহায়?" তুলসীবাবু বললে।

"ভদ্রলোক জানতে চান।"

"যখের ধনের খবর নিয়ে এসেছেন নাকি?"

"না। যখের ধন কী করবেন। এমনি....।"

"শুন বেটা," প্রসাদ তার হিন্দি ভাঙা বাংলায় বলল, নেশার গলায়, "আগর তুম ল্যাঙোটা সাধু চাস তো বরিয়া দ'তে চলে যাবি। পিপলিবাবার এই মন্দির ছিল। সে তোর বিশ পঁচিশ সাল আগে। টুটেফুটে সাফ। সাধুজিও মর গিয়া।"

এরা কেউ জানে না।

কথায় কথায় কত কী গড়িয়ে গেল, এখানকার সাত সতেরো কাহিনী। সবই বন জঙ্গলের গল্প, শিয়াল ভালুক সাপের গল্প, এমন কী ভূতপ্রেতেরও। দু দুটো বোতল শেষ। নিরাপদ ভূতের শ্রাদ্ধ করার জন্যে জল দিতে গেল বাইরে। আর ফেরে না।

ভৌমিকই শেষে বলল, "বিলাস, তুমি একবার চাঁদবাবুকে জিজ্ঞেস করতে পার। সবচেয়ে পুরনো লোক। আশি বছরের বুড়ো। রাইট ম্যান।"

বিলাস বলল, "করব। তাড়াহুড়ো নেই কিছু। ওঁরা তো আছেন এখন।"

ছয়

চার পাঁচটা দিন কেটে গেল।

গিরিজাশঙ্কর মোটামুটি গুছিয়ে বসেছেন 'উষাবীথি'তে। ঘরদোর আর অত ফাঁকা লাগে না, বন্ধবাড়ির ভ্যাপসা গন্ধও উবে গিয়েছে, জানলা দরজা খোলা থাকে সারা বেলা, রোদ হাওয়ায় ঘর ভরে যায়, বিকেল হতে না হতে সব বন্ধ, শীতের হাওয়া বাড়ছে, শীতও। বাগানের ঝাউগুলো ধুলো খাচ্ছে সারাদিন, তবু গাঢ় সবুজ, অজস্র ঝুঁটিফুল, করবী ঝোপ যেন ফোয়ারার মতন মাথা তুলেছে, পাতা ছড়াচ্ছে চারপাশে। শিউলি গাছে এখনও দু'দশটি ফুল আসে, পেয়ারা গাছের সাদা ফুলগুলো এবার ফল হয়ে এসেছে। ইঁদারার জলের স্বাদ গিয়েছে পালটে।

সেদিন আর হোটেল নয়। বিকেল ফুরোবার আগেই বড় টর্চ আর শিবানীকে নিয়ে বিলাস হাঁটতে হাঁটতে উষাবীথিতে পৌঁছে গেল। আসার সময় রাস্তা বাঁচিয়ে এসেছে। মাঠঘাট ভেঙে। ফেরার সময় রাস্তা ধরেই ফিরতে হবে।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, "এসো। এসো বউমা।"

শিবানী প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

অল্প কিছু কথা। রমাও এলেন।

প্রণাম সারা হলে রমা বললেন, "চলো আমরা ভেতর ঘরে গিয়ে বসি। সন্ধে হয়ে গেল।"

রমা চলে গেলেন শিবানীর হাত টেনে নিয়ে। ধীর পায়ে। "আমি আবার খানিকটা রাতকানা বউমা, তোমার মুখটিও ভাল করে ঠাওর করতে পারছি না। চলো ঘরে আলোয় বসে গল্প করব।"

ওঁরা চলে যাবার পর গিরিজাশঙ্কর সাধারণভাবে এখানকার কথা বললেন। ভালই লাগছে তাঁর। শীত এখনও প্রচণ্ড নয়। পৌষ পড়ে গিয়েছে। সামনেই ক্রিসমাস। আমি সকালে আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটি। বিকেলেও ঘুরি খানিকটা বাগানে। তোমার মাসিমাকে হাঁটাতে পারলাম না। পাঁচ পা হাঁটলেই বলে বুক কেমন করছে। তবে বডি ভালই আছে। সেদিন দেখি নিজের মনে গান গাইছে গুনগুন করে, 'কেন বঞ্চিত হব চরণে।' ও তো গাইতে জানত। আর গায় না। এক আধবার বড় জোর ঃ হরি দিন তো গেল....।

"চলো বিলাস, আমরা বসার ঘরে গিয়ে বসি। আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে।"

বসার ঘরে এসে বিলাস বলল, "রাত্রে একটু আগুন দিতে বলবেন। কাঠ কয়লার আগুন। মালসা করে দেবে। মালী জানে।"

"তোমরা দাও?"

"আমরাও দিই। তবে জানুয়ারির গোড়ায়। তখন এক আধদিন ভীষণ শীত পড়ে এখানে।"

"তোমার এখানে বিশ বছর হয়ে গেল না?"

"প্রায়।"

"বসো।"

"আপনি বসুন।"

গিরিজা বসলেন। বললেন, "তুমি কোথাকার লোক ? মানে আগে কোথায় বাড়ি ছিল?"

বিলাস বসল। কিন্তু বিব্রত বোধ করল। কোথায় তার বাড়ি ?

গিরিজা তাকিয়ে থাকলেন।

অস্বস্তি বোধ করছিল বিলাস। বলল, "বাড়ি কোথায় বলতে পারব না। অনেক জায়গায় থেকেছি। গিরিডি ভাগা, বিষণগড়। আমাদের বাড়ি ছিল না।"

গিরিজা কান পেতে শুনছিলেন যেন। একইভাবে তাকিয়ে আছেন বিলাসের দিকে। "বাবা!"

"বা-বা!" বিলাস ঢোঁক গিলল। দু' মুহূর্ত চুপ। "বাবাকে আমি দেখিনি। আমার বাবাকে। এখানে এসে যাঁকে পেয়েছিলাম তিনি আমার বাবা। হাজরা বাবা। বাড়িটা তাঁরই। হোটেলটা আমি নিজে করেছি।"

গিরিজাশঙ্কর হয়ত অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু মুখের ভাবে অশোভন কৌতূহল নেই। বরং সরল গলায় বললেন, "রক্ত দিয়ে সম্পর্ক হয়, তবে তার চেয়েও বেশি হয় ভালবাসা দিয়ে। তুমি তো মহাভারত পড়েছ! ভীষ্মর কি স্ত্রী ছিল, না ছেলেপুলে ছিল — কিন্তু কৌরব আর পাণ্ডবরা — কে না তাঁর ভালবাসার পাত্র ছিল। আমার তো মনে হয় ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান-শোক সাংসারিক, কিন্তু ভীষ্মের যে শোকদুঃখ, যা তিনি পেয়েছিলেন জীবনে তার গভীরতা অনেক বেশি, তিনি যে আত্মিক শোক নিয়ে বিদায় নিলেন তার কোনো শেষ নেই।"

বিলাস অবাক হয়ে গেল। কী যেন মনে হল। ভেতরে কোথাও কষ্ট হচ্ছিল, তবু বিব্রত ভাব যেন অতটা থাকল না। নিজেই হঠাৎ বলল, "আমার মা হাসপাতালে কাজ করত। মা মারা যাবার পর আমি ঘুরতে ঘুরতে একদিন এখানে এসে পড়ি। হাজরাবাবা আমায় আশ্রয় দেন। আমার কিছুই ছিল না, একটা ভাঙা সাইকেল, দু-একটা ছেঁড়াফাটা জামা ধুতি গামছা ছাড়া। উনি আমায় তুলে না নিলে আগের মতনই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হত।"

চা নিয়ে এল বদ্যিনাথ। বিলাসের জন্যে চা, কুচো নিমকি, দুটো মিষ্টি। কর্তার জন্যে পাতল লিকার।

গিরিজাশঙ্কর চা নিতে বললেন বিলাসকে। "সাধনের মুখে আমি একটু আধটু শুনেছি।"

"সবাই জানে। বাড়ি হাজরাবাবার। আমি আসার অনেক আগেই ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। একাই থাকতেন উনি। কাজের লোক ছিল একজন। কাঠগোলার দু'একজন পোষ্য।" বলতে বলতে বিলাস যেন আবেগ বোধ করছিল। "অদ্ভুত মানুষ ছিলেন হাজরা- বাবা। মারা যাবার অনেক আগেই তিনি আমায় একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওই জায়গাতেই যেন ওঁকে দাহ করা হয়।"

গিরিজাশঙ্কর শুনলেন। তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন. "ওঁর স্ত্রীকেও কি ওখানে দাহ করা হয়েছিল!"

"জানি না। আমায় কিছু বলেন নি।"

ঘরের মধ্যে শীত জমে যাচ্ছিল। সাধারণ একটা টেবিল বাতি জ্বলছে। চিমনির কাচ ঘোলাটে। ঘরের বেশির ভাগটাই অন্ধকার মতন। বাইরে বারান্দায় ছোট পেট্রোম্যাক্স বাতিটা জ্বালানো হয়নি। প্রয়োজন নেই হয়ত।

গিরিজাশঙ্কর কাশলেন বার কয়েক। শুকনো কাশি। এ-বাড়ির একটা বেড়াল ঘরে ঢুকে কোণার দিকে গিয়ে শুয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ ভাব।

চা খেতে খেতে বিলাস বলল, "আপনার বাড়ি?"

অন্যমনস্ক ছিলেন গিরিজা। খেয়াল হল। বললেন, "আমাদের আদি বাড়ি, টাকি। চব্বিশ পরগনা। নাম শুনেছ? নামকরা জায়গা। সেখানে ছেলেবেলা। তারপর হুগলি চুঁচড়ো। সেখান থেকে কলকাতা। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চাকরি। কপাল ভাল, একেবারে তলা থেকে শুরু করতে হয়নি। দু'ধাপ এগিয়ে পা রাখতে পেরেছিলাম। পরের জীবনটা চাকরি করেই কেটেছে। সরকারি বেসরকারি। একটা জায়গায় উঠতে পেরেছিলাম বলতে পার। কিন্তু...." বলতে বলতে থেমে গেলেন উনি।

বিলাস নিমকি শেষ করে চায়ের কাপ রেখে দিল। শিবানীদের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভেতরের ঘরে আছে কোথাও। বুড়ির সঙ্গে গল্প করছে। বুড়ি কি শিবানীকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করবেন? মেয়েলি গল্পে এমন হয়। যদি জানতে চান কী বলবে শিবানী? সে অবশ্য বোকা নয়। সামলে নিতে পারবে। গিরিজাশঙ্করের দিকেই তাকিয়ে থাকল বিলাস।

"কী বলছিলাম --! চাকরি!" গিরিজা বললেন, "হ্যাঁ, চাকরি করেছি — তিরিশ বত্রিশ বছরের বেশি। ঘুরেছি নানা জায়গায়. মিরাট দেরাদুন, দিল্লি, আগ্রা। কলকাতায় ফেরত। একটা মাথা গোঁজার জায়গাও করেছি বেলুড়ে। ভাল লাগে। বুড়োবুড়ি থাকি।"

"আপনাদের ছেলেমেয়ে?"

"ছেলে বিদেশে। ডাক্তারি পাস করে গিয়েছিল বিলেতে এফ. আর. সি. এস পড়তে। সেখান থেকে ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেল আমেরিকা। নিউরো সার্জন। অনেক টাকা, মানে ডলার জোটে দু'হাত ভরে ডাক্তারদের ওদেশে। বড় বাড়ি, আপেল বাগান, বাড়ির মধ্যে সুইমিং পুল. দু' তিনটে গাড়ি বোধ হয়। বিয়েও করেছে বার দুয়েক। একজন ছিল এদিককার গুজরাটি, ওখানেই ব্যাকটেরিয়া নিয়ে রিসার্চ করত। তাকে ছেড়ে দিল, বনিবনা হ'ল না। এখন আমেরিকান বউ।"

বিলাস বোকার মতন শুনছিল কথাগুলো।

গিরিজা নিজেই আবার বললেন, "ছোট ছেলে ছিল আর্মিতে। নাগাল্যাণ্ডের দিকে

তাদের স্টেশন। কনভয়ের সঙ্গে যাচ্ছিল। অ্যামবুশ হয়ে মারা গেল।"

মারা যাওয়াটা বোঝা যায়, বাকিটা বুঝতে পারল না বিলাস।

"মেয়ে আছে আমাদের।" গিরিজা বললেন, "বম্বেতে থাকে। গোয়ানিজ এক ফটোগ্রাফারকে বিয়ে করেছে। মডেলিং করে।" দু'মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, "মেয়ের চিঠি মাঝে মাঝে পাই। দু'তিন বছর অন্তর একবার হয়ত আসে। কোথায় বম্বে কোথায় বেলুড়। অ-নেক, অ-নেকটা দূর।"

বিলাস চুপ। পাশে কোথাও কাননের গলা শোনা গেল। পৌষের দমকা হাওয়ায় দরজার পাল্লা নড়ে উঠল সামান্য।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। বেড়ালটা জায়গা বদলে নিল। বিলাস অকারণে পাশে রাখা টর্চটা তুলে নিল কোলে।

গিরিজাশঙ্কর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন না। গলার স্বরও বসল না। তবু বিষণ্ণ। বললেন, "তুমি এই ছোট্ট জায়গায় কত দূরে একপাশে পড়ে থাকো। আমেরিকা, সান্‌ফ্রান্সিসকো, নাগাল্যাণ্ড, মডেলিং — কিছুই বুঝবে না। ও সব অন্য জগৎ। আমিও বুঝি না, বিলাস। ....তা তোমার বোঝার দরকার কিসের! এই তো বেশ আছ! চোখ মেলে চন্দ্র সূর্য দেখছ, তারা দেখছ, গায়ে বাতাস লাগছে, জলে ভিজে শীতে কেঁপে এই তো বেশ। দু'মুঠো পেটে যাচ্ছে তোমার, গায়ে জামা উঠছে। বউমা আছে পাশে তোমার। এই ভাল।"

বিলাস নির্বোধ নয়। বিদ্যায় তার দখল কম, কিন্তু তার অনুভব ক্ষমতা তো রয়েছে। সে ওপরকার ব্যাপারগুলো বুঝল না, ভেতরটা অনুভব করতে পারল।

রাত হচ্ছে। উঠে পড়তে হয়। বিলাসের হাত ঘড়িতে প্রায় আটটা।

"আমি এবার উঠব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত হয়ে যাচ্ছে। বউমাকে ডাকতে হয়। বুড়ির তো কিছু খেয়াল থাকে না। দাঁড়াও দেখি।"

"আপনি বসুন, আমি দেখছি।"

বিলাস দু'পা এগিয়ে বদ্যিনাথকে ডাকল। সাড়া পাওয়া গেল বদ্যিনাথের। তারপর শিবানীর।

আসার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিরিজাশঙ্কর বললেন, "অনেকটা যেতে হবে তোমাদের। বেশ অন্ধকার হে!"

"আমাদের অভ্যেস আছে। টর্চও আছে।" বিলাস বলল।

শিবানী প্রণাম সেরে গায়ের শালের খানিকটা মাথায় দিল। কান ঢাকল।

রমা বললেন, "আবার এসো বউমা। সকাল সকাল চলে আসবে। সারাদিন

থাকবে। দুটো ডালভাত খাবে। দু'জনেই।"

গিরিজা ঠাট্টার গলায় বললেন, "তুমি রাঁধবে নাকি ?"

"কেন! আমার হাত কি ঠুঁটো হয়ে গিয়েছে।"

"ভাল। হাতের গুণ পাতেই পাওয়া যাবে।"

একটু হাসি। শিবানীও হাসল।

আসবার সময় খেয়াল হল বিলাসের। গিরিজার দিকে তাকাল। বলল, "ভাল কথা। আপনি একটা গুহার কথা বলছিলেন। আমি অনেক খোঁজ নিয়েছি। এখনও কোনও গুহা নেই।"

"নেই! ....থাকবারই তো কথা।"

"কেউ জানে না।"

"আমি যে পড়েছি। ....পরে তোমায় বলব। আর রাত করো না। এসো।"

বিলাস আর শিবানী নেমে এল বারান্দা থেকে।

সাত

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কথা হচ্ছিল।

আজ দু'দিন ধরে শিবানী সকাল দুপুর নতুন লেপটায় রোদ খাইয়ে ঝাড়াঝাড়ি করেছে। কোথাও এক রত্তি তুলোর আঁশ নেই। ওয়াড় পরিয়েছে আজই। তার শীত বেশি। সামান্য ঠাণ্ডাও লেগেছে রাত্রে 'উষাবীথি' থেকে হেঁটে ফেরার সময়।

লেপ গায়ে টেনে নেবার আগে মাথার খোঁপা আলগা করে নিল শিবানী, বালিশ গুছিয়ে নিল। শুয়ে পড়ার আগে অভ্যেস মতন অন্ধকারে চার পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "তখন যা বলছিলাম। বাড়িটা কাছাকাছি হলে সন্ধেবেলায় মাঝে মাঝে যেতাম মাসিমার কাছে। বড্ড একা।"

বিলাসও গিরিজাশঙ্করের কথা ভাবছিল। খেতে বসে স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়া ছাড়া কথাও হয়েছে বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নিয়ে। বাকিটা যেন জমানো ছিল; শুতে যাওয়ার পর কথা হবে।

বিলাস বলল, "তোমার খুব ভাল লেগেছে!"

"ভীষণ। এমন আদর করে কাছে বসালেন, হাত ধরে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলছিলেন যেন কত নিজের।"

বিলাস ভাবছিল এক কথা, মুখে অন্যরকম বলল, হালকা ভাবেই, "সে তো আমিও তোমার গায়েটায়ে কত আদর করে হাত বোলাই।"

"যাঃ, কিসের থেকে কী কথা!"

"তা ইয়ে—! মানে, আমি ভাবছিলাম উনি তোমার বিয়ের কথাটথা জিজ্ঞেস করবেন। মেয়েদের কথা তো! জানতে চাননি?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ—! কী বললে?"

শিবানী দু'মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, "ও সব কিছু বলিনি। বললাম বিয়ে হয়েছে ছ'সাত বছর হল।"

"ভাল করেছ। তোমার বাড়ি মা বাবার কথা জানতে চাইলেন না?"

"চেয়েছিলেন। ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বলেছি। বলেছি, আমার এখন কেউ নেই বাপের বাড়ির।"

বিলাস যেন আশ্বস্ত হ'ল। তাদের বিয়ের গল্প যদি সাদামাটা হ'ত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। কদর্য ব্যাপার অনেকটাই মিশে আছে। সেটা বলা যায় না। বললে শিবানী লজ্জা পেত, গ্লানি বোধ করত। তার দোষ থাকুক বা না থাকুক।

বিলাস পাশ ফিরল। "আমাদের একটা আড়াল থাকে, বুঝলে! সব কথা আমরা বলতে পারি না। কেউ পারে না।"

শিবানী চুপ করে থাকল। তাকে বোঝাবার কিছু নেই, সে বোঝে, বিলাসের চেয়ে ভাল করেই বোঝে, কেন না সে মেয়ে, তাকেই না যত যন্ত্রণা, লজ্জা, জ্বালা সইতে হয়েছে। তবে মানুষের মন বলে কথা। অনবরত পলি পড়ছে, ছোট বড় কত আঁচড় শুকিয়ে যাচ্ছে সময়ে। সত্যি বলতে কী, শিবানী সেই মেলার কথা এখন যেন ভুলেই গিয়েছে। আচমকা যদি মনে পড়ে যায় কখনো সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাড়িয়ে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। না, শিবানী বাস্তবিকই এখন সেই দিন বা তখনকার থেকে আলাদা।

বিলাস বলল, "উনি— ভদ্রলোক আমায় অবশ্য বিয়ে-থার কথা জিজ্ঞেস করেননি। দেশ বাড়ির কথা জানতে চাইছিলেন, মা-বাবার কথা। সত্যি কথাই বলেছি। তবে আমার মা যে হাসপাতালে আয়ার কাজ করত, তা না বলে বলেছি হাসপাতালে কাজ করত।"

"একই হ'ল!"

"না, তা ঠিক নয়। ময়লা কাপড় আর ফর্সা কাপড়ে তফাত থাকে।... মাকে আমি ছোট করব কেন! হলেই বা আয়া, মা আমাকে খাইয়েছে পরিয়েছে, মানুষ করেছে। মায়ের হাতে টাকা পয়সা জুটত রোগীর ময়লা ঘেঁটে। সেই পয়সায় মা আমাকে স্কুলেও পড়িয়েছে। তবু তোমার কাছে মাকে নিয়ে বলতে আমার লজ্জা করে না, গর্ব হয়। বাইরের লোকের কাছে বলতে আটকে গেল!"

শিবানী লেপের তলা দিয়ে স্বামীর গা ছুঁল। "ও কিছু না। আমারটা তো আরও লজ্জার।"

"অথচ, আমি—" বিলাস বলল, "এখানে যখন আসি, চালচুলো নেই, তখন হাজরাবাবাকে মায়ের কথা বলতে লজ্জা পাইনি। ...কী জানি, মানুষের তফাত, না, দু'জায়গার দু'রকম পজিসনের লোকের তফাত! নাকি, আমি শালা এখন পরের ধনে পোদ্দারি করে ভদ্দরলোক হয়ে গেছি।"

শিবানী এবার প্রায় খামচে ধরল বিলাসকে। "কী হচ্ছে! রাতে ঘুমোবার সময় আর আজে বাজে কথা ভাবতে হবে না।"

"না"

"না। ... শোনো, মাসিমা আমায় বাচ্চাকাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, দু'বার এসেছিল। দুটোই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

বিলাস কথা বলল না। শিবানী এখন আর হাত দিয়ে খামচে নেই তাকে। বরং টানছে। পায়ে পা লাগল।

শিবানী নিজেই আবার বলল, "মাসিমাদের ছেলেমেয়ের কথা শুনলে না।"

"শুনলাম।"

"থেকেও তো ওই।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আর লাভ কিসের থাকার!"

বিলাস বলল, "তাই দেখছি।" বলে শিবানীর হাতে হাত জড়িয়ে নিল।

খানিকটা পরে বোধ হয় গুমোট কাটাতে হঠাৎ হালকা গলায় বলল, "তোমার তো বয়েস ফুরোয়নি থাকার। হয়ত থেকে যাবে একদিন।"

মাথা নাড়ল শিবানী। "আমার থাকবে না। ওরা বলেই দিয়েছে।"

আচমকা শীত ধরে কেঁপে উঠেছিল শিবানী। ঘুমের মধ্যেই। জড়সড় হতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। বোঝা না বোঝার কয়েকটি দণ্ড। তারপর নিজের অবস্থাটা অনুভব করল। গায়ের লেপ অর্ধেকটা নেই, শাড়ি জামা এলোমেলো। পাশে বিলাস শুয়ে নেই। উঠে পড়ে বিছানায় বসে আছে, তার গায়ে কোলে অর্ধেকটা লেপ। ঘরের একটি মাত্র জানলার একপাট খোলা, বাকি জানলা বন্ধ। মশারির মধ্যে দিয়েও বোঝা গেল, ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকার আর ময়লা আলো মেশামিশি।

শাড়িজামা অগোছালো করেই উঠে পড়ল শিবানী। তার ভাগের লেপ টেনে বুক পিঠ ঢাকল। "কী হ'ল তোমার?"

বিলাস কেমন বিমূঢ়ভাবে বসে আছে। জবাব দিল না।

স্বামীকে নাড়া দিল শিবানী। "কথা বলছ না?"

কথা বলল বিলাস। সামান্য পরে। "একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।"

"স্বপ্ন!" যাক, শিবানী খানিকটা নিশ্চিন্ত। বিলাসের স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে সে নতুন কিছু দেখল না। এমন তো হামেশাই হয়। তবে এক একদিন স্বামীকে সে এমন অবস্থায় উঠে বসতে, তাকে টেনেটুনে আঁকড়ে ধরে উঠিয়ে দিয়ে ভয়ার্তভাবে ডাকতে শুনেছে — তেমন ঘটনা ঘটলে সে নিজেও ভয় পেয়ে যায়। স্বামীর গা ঘেঁষে শিবানী বলল, "তা উঠে বসে আছ কেন?"

কোনো জবাব দিল না বিলাস।

"শোও। শুয়ে পড়ো। এখনও দেরি আছে সকাল হতে।"

"না। তুমি শোও।"

"এই ভাবে বসে থাকবে? পাগলামি!"

"কী দেখলাম, জান? ...দেখলাম একটা গুহা। কালো কুচকুচে। ভেতরে অন্ধকার। আর সেই গুহার সামনে গিরিজাবাবু। গিরিজাবাবুর পোশাকটা আমার খেয়াল হচ্ছে না। উনি গুহার সামনে পাহাড়প্রমাণ পাতা কাঠকুটো জুটিয়ে স্তূপ করেছেন। তাতে আগুন দিচ্ছেন। একটু জ্বলেই নিভে যাচ্ছে সেগুলো। উনিও যেন নাছোড়বান্দা। শেষে হাওয়া এল, পাতা কাঠকুটো কাঠি জ্বলতে লাগল। ছাই আর আগুনের ফুলকি উড়তে লাগল বাতাসে। কী ছাই রে বাবা! উড়ছে তো উড়ছেই। ঘূর্ণি হয়ে উড়ে গেল আকাশে অনেকটা ছাই, তার পরই দেখি গিরিজাবাবু সেই পোড়া জায়গাটায় শুয়ে আছেন। ডাকাডাকি করলাম, সাড়া নেই।"

শিবানী এই আধা ভোরে অলক্ষুণে কথাটা শুনে যেন শিউরে উঠল।

"কী বিচ্ছিরি! একেবারে ভোরে!" শিবানী বলল। বলেই সান্ত্বনা দিল স্বামীকে। "যাক, স্বপ্ন — যত খারাপই হোক স্বপ্ন তো! .... আর তোমার যত উদ্ভট উদ্ভুট স্বপ্ন দেখার অভ্যেস। বাদ দাও।"

"কিন্তু গুহা।"

"কিসের গুহা?"

"উনি আমায় বার কয়েক গুহাটার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি বলতে পারিনি। এখানে অনেককেই জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলতে পারল না। বলল, এখানে কোনো গুহাই নেই।"

"তা হলে নেই। থাকলে কি কেউ জানবে না!"

"মনে তো তাই হয়। তবে একবার চাঁদবাবুকে জিজ্ঞেস করব। তিনি এখানকার আদি বাসিন্দে। ওঁর বয়েস এখন আশি ছাড়িয়েছে। ওঁর বাবার আমল থেকে আছেন। এদিককার খোঁজখবর ওঁর চেয়ে কেউ বেশি জানে না। জানলে উনিই জানবেন।"

"তা জেনে নিও।"

"আজই যাব।"

"আজ!"

"হ্যাঁ, আজ। চাঁদবাবুকে অনেকদিন দেখিনি, যাওয়া হয় না ওদিকে। ওঁর বয়েস হয়েছে। যাই, একবার দেখা করে আসি।"

শিবানী দেখল, আরও ফরসা হয়ে আসছে শীতের জড়সড় আবছা ভোর।

আট

চাঁদবাবুদের বাড়িটা বিচিত্র। চারদিকে চার টানা — একতলা বাড়ি — এরা বলে মাকান। কোথাও পাকা ছাদ সেকালের, কোথাও টালি বা খাপরা। ঘরের সীমাসংখ্যা নেই এক একটি মাকানের। বড় ঘর, ছোট ঘর, ঘুপচি ঘর। ঢালু বারান্দা। দরজা জানলা সব মোটা মোটা, শালের। কাঁঠাল কাঠও আছে হয়ত। চার মাকানের মধ্যিখানে পাকা উঠোন। তা অন্তত বিঘেখানেকের উঠোন। কোথাও কোথাও ভেঙেছে, গর্ত হয়েছে। এ-বাড়িতে কত লোক থাকে বলা যাবে না। চার ভাইয়ের চার গোষ্ঠীর বাড়ি ও সংসার। তার ওপর কাজকর্মের লোক, এ-জন, সে-জন। গোরু মোষও আছে। আর একরাশ পায়রা।

বাড়ির চৌহদ্দিও বেশ বড়। উঁচু পাঁচিল। যেন দুর্গের পাঁচিল। এখন অনেক জায়গায় ভাঙা। সার সার গাছ। নিম কাঁঠাল পেয়ারা আম। মিলেমিশে প্রায় জঙ্গলের চেহারা হয়েছে।

চাঁদবাবুদের একসময় বিস্তর জমিজমা ছিল। চাষ আবাদ হ'ত, ফলের বাগান ছিল। তখন জঙ্গল কেনাবেচা হত। শাল জঙ্গলও ছিল তাঁদের। দু'পুরুষের ভোগ ভোজন ভালই হয়েছে। সময় পালটে গিয়েছে অনেকদিনই। অবস্থাও পড়েছে। জ্ঞাতিগোষ্ঠী বেড়েছে, আলাদা হয়ে গিয়েছে। যে যার নিজের ভাগের ঘরদোর, সংসার, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পড়ে আছে।

চাঁদবাবু থাকেন পুব বাড়িতে। তাঁর ঘর ইদানীং আলাদা। পুরনো টালি-ছাওয়া ঘর। এক ফালি বারান্দা।

তুলোর জামা পরে রোদে বসেছিলেন চাঁদবাবু। শীতের রোদ পোয়াচ্ছিলেন। পায়ে মোজা। ওঁর মাথায় এখন চুল প্রায় নেই। যা আছে তাও সাদা। মুখে দাড়ি। তাও পাকা।

বিলাস সাইকেল থেকে নেমে পড়েছিল আগেই। কাছে গিয়ে নামলে অভদ্রতা

হত। আশি বছরের বুড়োর মুখের সামনে গিয়ে নামা যায় না।

সাইকেল রেখে বিলাস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল চাঁদবাবুর কাছে। সহবত মতন প্রণাম করল।

"কে ?"

"বিলাস।"

"ও বিলাস! মনে হচ্ছিল। চোখে ছানি কাটিয়েও ভাল দেখতে পাই না। এদিকে কোথায় এসেছ?" চাঁদবাবুর পাশে একটা টুলের ওপর বড় মাপের এক গ্লাস। কাচের। গ্লাসের মধ্যে আদা, গোলমরিচ, মধু দিয়ে তৈরি এক পদার্থ। শ্লেষ্মা দূর হয় নাকি এতে।

বিলাস একটু ঘুরিয়ে বলল, "এদিকেই একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। কেমন আছেন আপনি?"

"আমাদের থাকা--! আছি। ওপরঅলা যতক্ষণ না ডাকছেন ততক্ষণ তো যাওয়া যাবে না।"

"তা কেন---!" বিলাস হেসে বলল, "আপনাকে কাহিল দেখছি না। শীতকালটা কাটাতে পারলেই আরও ভাল থাকবেন।

বারোয়ারি বিশাল উঠোনে যেন বাজার বসতে শুরু করেছে। বয়স্ক, মাঝারি থেকে বাচ্চাকাচ্চারা পর্যন্ত যে যার এলাকায় নেমে পড়েছে। কোথাও উনুন ধরছে -- তার ধোঁয়া, কোথাও ইঁদারা থেকে জল তোলার শব্দ। কলরব। অঢেল রোদ নেমে গিয়েছে উঠোনে।

বিলাস বলল, "একটা কথা জানতে এলাম আপনার কাছে।"

"কী কথা?"

"এখানে এক ভদ্রলোক এসেছেন। বয়েস হয়েছে। পঁয়ষট্টি মতন। তিনি আমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"কে ভদ্রলোক ?"

"তিনি কলকাতা — বেলুড় থেকে বেড়াতে এসেছেন স্ত্রীকে নিয়ে। শরীর সারিয়ে ফিরবেন। 'উষাবীথি' সাধন মল্লিকবাবুদের বাড়িতে উঠেছেন।"

"উষাবীথি! পনিবাবুদের বাড়ির দিকে। কতকাল বেরোই না। খেয়ালও থাকে না সবসময়।"

"আজ্ঞে।"

"কথাটা কী?" চাঁদবাবু টুলের ওপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বার দুই চুমুক দিলেন।

"এখানে কোন গুহা আছে?"

"গু-হা। কেন"

"ভদ্রলোক বলছেন, আছে বলে তিনি জানেন। আমরা তো জানি না। অনেককে জিজ্ঞেস করলাম কেউ বলতে পারল না।"

চাঁদবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। গ্লাসে চুমুক দিলেন আবার। সামনে তাকিয়ে থাকলেন, অন্যমনস্ক। ভাবছিলেন। শেষে বললেন, "না, মনে করতে পারছি না। তবে এদিকে যখন রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়, সে তো একশো সোয়াশো বছর আগের কথা— আমাদের বাবাদের আমলে — তখন ওই নদীর দিকে রেলব্রিজ বানাবার সময় দু পাশের পাথর ফাটিয়ে সাহেবরা রেল-লাইনটা সাঁকো পর্যন্ত টেনে নিয়েছিল। তখন ওদিকে কালো পাথরের উঁচু উঁচু ঢিবি মতন ছিল। পাহাড়তলিতে যেমন থাকে। এখনও সেখানে পাথরটাথর পড়ে আছে হয়ত। আমি জানি না।"

মন দিয়ে শুনল বিলাস। জায়গাটা সে বুঝতে পারল। এখান থেকে মাইল দেড়েক। নদীর দিকে। ছোট ব্রিজও আছে।

চাঁদবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্রলোক কে ? কী করেন? সার্ভে অফিসে কাজ করতেন নাকি ?"

"না। উনি সরকারি বেসরকারি অফিসে হাই পোস্টে কাজ করেছেন। এখন তো রিটায়ার্ড।"

"ও! ... এ দিকে আগে এসেছেন উনি?"

"না।"

চাঁদবাবু চুপ। আর কী বলবেন!

বিলাস বুঝতে পারল, চাঁদবাবু যা জানেন বলেছেন। সত্যি তো। পাহাড়ি পাথরের চাঁই ফাটাবার সময় যদি কোনও ছোটখাট গুহা থেকেও থাকে, ভেঙে ছিটকে গিয়েছে

"আমি তা হলে আজ চলি।" বিলাস বলল।

"এসো। তোমার হোটেল কেমন চলছে?"

"মোটামুটি।"

"আমাদের সেই কেদার মাস্টারমশাইয়ের খবর জান নাকি ?"

"আজ্ঞে না।"

"আজকাল লোকজন কেমন হচ্ছে সিজন টাইমে?"

"আগের মতন হয় না। পুজোর সময়টাতেই যা ভিড়। এখন আপনার অনেক বাড়িই ফাঁকা পড়ে থাকে।"

"হুঁ। .... হাওয়া বদলাবার দিন ফুরিয়ে গেছে। লোকে এখন কত ব্যস্ত, বেড়াবার জায়গাও হয়েছে অনেক, টানাটানিও আছে মানুষের। ... তা এসো তুমি। এদিকে আবার এলে দেখা করে যেও।"

"আজ্ঞে যাব।" বিলাস বলল। বলে আবার প্রণাম করল চাঁদবাবুকে। সেকালের মানুষ এঁরা। তাঁদের সময়ের সহবত মানলে খুশি হন।

সাইকেল টেনে নিয়ে ফিরে চলল বিলাস।

স্টেশন এখান থেকে অনেকটা দূর। তবে পথ চলা সরু রাস্তা সাইকেল-চলার পক্ষেও খারাপ নয়। আশেপাশে কাঁকুরে জমি, কোথাও কোথাও ছোট সব্জি খেত, কুঁড়ে ঘর একটি দুটি। জংলিফুলের ঝোপে হলুদ হলুদ ছোট প্রজাপতি উড়ছে। রোদ এখন এমন ঘন গাঢ় যে শীত যেন গায়ে লাগে না আর।

আসবার সময় বিলাস সকালে দেখা স্বপ্নের কথাই ভাবছিল। কেন ভাবছিল কে জানে। আর যাই দেখে থাকুক তা নিয়ে তার মন খারাপ হবার বা খুঁত খুঁত করার কারণ নেই বড়। কিন্তু গিরিজাবাবুকে যেভাবে দেখেছে — তাতে তার মনটা ভাল লাগছিল না।

স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু কখনো কখনো মানুষ যা দেখে তা ঘটেও যায়। হয়ত অন্যভাবে, কিছু পরে। বিলাস মোটেই চায় না, গিরিজাবাবুর হঠাৎ এখানে কিছু হয়ে যায়। সেটা মর্মান্তিক হবে। বুড়িরও তখন কী হবে কে জানে! কোনও কারণ নেই — তবু বিলাস যেন কেমন এক দায়িত্ব ও দুর্ভাবনা বোধ করছিল। সাধনদা তার ভরসাতেই না বুড়ো-বুড়িকে পাঠিয়েছেন!

তো, তো — বিলাস কী করবে! মাটিতে পড়ে গেলে মানুষকে হাত ধরে তোলা যায়, জীবন থেকে পড়ে গেলে কিছুই যে করার নেই। এ ভগবানের নিয়ম। গিজরাবাবাকেই কি তা হলে ছেড়ে দিত বিলাস।

বেলা বাড়ল। হোটেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিলাস।

নিরাপদ নিজের মালগুদোম ছেড়ে বাজারে এসেছিল কী কিনতে। ফেরার পথে হোটেলে এল। "কই হে, চা খাওয়াও এক ভাঁড়।" নিরাপদ কখনও 'কাপ' বলে না — ভাঁড় বলে। মদ্য পানের সময়েও সে গ্লাসকে বলে বাটি। শালাকে ঘটি দিলেও সাবাড় করে ফেলবে তো বাটি।

বিলাস চা দিতে বলল।

নিরাপদ বসল সামনে। সিগারেট দিল বিলাসকে। ধরিয়ে নিল।

"পালিয়ে এসেছ যে! আজ মাল খালাস হচ্ছে না?"

"বড়বাবু আছেন। তিনটে মাত্র ওয়াগন আজ। চুন, শালখুঁটি আর মিক্সড মাল। তাতে শালা বোধ হয় ট্যান করা চামড়ার প্যাকিং আছে। গন্ধ কী! কুলিগুলো মরে যাবে।"

"তুমি তাই পালিয়েছ?"

"না। আমি বড়বাবুর বউ — মানে বউদির আব্দার রাখতে বাজারে এসেছি।

নিরাপদর নিজের বউ অছে। মিষ্টি চেহারা, রং শ্যামলা, হাসিখুশি। বয়েসও কম একটি বাচ্চা বছর চারেকের। বউকে রীতিমত দাবিয়ে রেখেছে নিরাপদ, নয়ত তা মদ্যপানের বাড়াবাড়ি থাকত না।

বিলাস জানতে চায়নি, আব্দারটা কী বড় বাবুর বউয়ের। নিরাপদ নিজেই বলল "জাড়া মুরগি। বউদির ভাই ভাই-বউ এসেছে। দিদির কাছে। থাকবে দু'চার দিন বউদি বলল, আপনার দাদা মাংসই খায় না তো মুরগি চিনবে কেমন করে। আপনি ভাই আমায় দুটো মুরগির ব্যবস্থা করে দিন। ....আমি তো দেওর লক্ষ্মণ, বেরিয়ে পড়লাম। ভিখুর কাছে গিয়ে বললাম, এই ব্যাটা দুটো আচ্ছা মাল কেটে কারি বানাবি বানিয়ে বড়বাবুর কোয়ার্টারে দিয়ে আসবি।"

চা এল।

বিলাস হেসে বলল, "চাইলেন মুরগি, তুমি একেবারে কারি বানিয়ে সাপ্লাই করছ।"

চায়ে চুমুক মেরে নিরাপদ বলল, "তোয়াজ করছি। লুকোচুরি নেই ভাই। আমরা দু'জন, কিন্তু গুদোমের ইনকাম ফিফটি ফিফটি হয় না। সেভেনটি থারটি হয়। ওটা বাড়াতে হবে। আমিও বউ বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। প্লাস আমার ইয়েটিয়ে আছে।"

বিলাস হেসে ফেলল।

এখানকার বড়বাবু বছর দুই হ'ল বদলি হয়ে এসেছেন। চেহারায় নধর, ধুতি শা পরেন। হাসিটি মধুর। বিনয়ের ভাব আছে। বৈষ্ণব বংশের মানুষ বলে মনে হয় তাঁকে মাঝে মাঝে নিজের কোয়ার্টারে কীর্তন লাগিয়ে দেন। কিন্তু মানুষ পাকা। ছেলে থাকে জেসিলিন বোর্ডিং স্কুলে। পুজোর মুখে যে বিশেষ প্রণামী পান এদিককার ব্যবসাদারে কাছ থেকে তাতে বউয়ের একটা গয়নাও হয়ে যায়।

বিলাসের এত কথা জানার নয়। নিরাপদই বলেছে। নিরাপদর বয়েস কম, পঁয়ত্রি ছত্রিশ। বিলাসের চেয়ে ছোটই। তবে বন্ধুত্বের বেলায় কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে চলে মানুষটি এমনিতে ভাল। রগুড়ে। আসক্তি বলতে মদ। ও নাকি স্কুল টপকানোর প থেকেই 'চুকে চুকে' ট্রেনিং নিয়েছে। মদ্যপানকে বিলাস বলে 'চুক চুক'। ওর গুণ আছে। কলেজে ঢুকে নাটক করত। ভালবাসত নাটক। বাঁকুড়া কলেজে তার বে নামডাক হয়েছিল। পরে বেচারি জীবনের নাটকে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। বলে কোনও ক্ষোভ নেই তায়ে।

"তোমার ব্যাপার কী?" নিরাপদ বলল।

"কিসের ব্যাপার?"

"তাসে আসছ না। চুকচুকে বসছ না।"

"বাঃ, সেদিন তো বসলাম।"

"শীত জমেছে বলে বউতে জমছ সন্ধে থেকে ? কী গো?"

বিলাস হেসে ফেলল। বলল, আমাকে পাঁচ দিক সামলাতে হয়। পেটের চিন্তা করতে হয়। তোমার মতন রেলগুদোমের ছোটবাবু তো নয়।"

"আমরা বলাবলি করি। আড্ডা পাতলা হচ্ছে।"

বিলাস বলল, "কী করব বলো। উষাবীথিতেও যেতে হয় এক আধদিন। দেখাশোনার দায়টা তো আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সাধনদা।"

নিরাপদ চায়ে চুমুক মারল শব্দ করে। "বুড়োবুড়িতে কিসের রস পাও?"

হাসল বিলাস। "চলো একদিন, দেখবে।"

"যাব। .... তা তুমি কাল মিস্ করবে না। কাল তাসে তুমি আমার পার্টনার। ভাল জিনিস খাওয়াব।" উঠে পড়ল নিরাপদ, "চলি।"

হঠাৎ খেয়াল হল বিলাসের। বলল, "এই শেনো। তুমি তো রেলের বাবু। ওই যে সাঁকোটা আছে — রেল লাইন, সেটা এখান থেকে কত দূর হবে আন্দাজ। মাইল দেড়েক?"

"বেশি। আমাদের নেক্সট স্টেশনের ডিসটেন্স হচ্ছে সাত কিলোমিটার। সাঁকো প্রায় ওপারেই স্টেশন। ....কেন?"

"এমনি। আচ্ছা তুমি জানো ওটা কতকাল আগে তৈরি হয়েছিল? গল্পটল্প তো হয় তোমাদের। শুনেছ!"

"যা বাব্বা! আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজ রাখব কেন?"

"জানো না?"

"না। ....তুমি সাঁকো নিয়ে কী করবে! তা ছাড়া বিলাসবাবু, তুমি আমার চেয়ে অন্তত ষোলো বছর আগে এখানে এসেছ। আমি বছর চারেক। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানবে এদিককার খবরাখবর।" নিরাপদ পা বাড়াল। "তোমার কি এবার সাঁকো দেখার স্বপ্নপালা চলছে!"

বিলাস জবাব দিল না।

হোটেলে আজ লোক বেশি আসতে পারে। প্রতি বৃহস্পতিবার এই লাইন দিয়ে একটা মিক্সড ট্রেন যায়। ফলে আশপাশ থেকে লোক আসে বেশি। দুপুরে ট্রেন হোটেলে খায়দায় অনেকেই।

আরও বেলায় বদ্যিনাথ এল। হাতে ফর্দ।

"মুদিখানা! ....যাব আমি। না তুমি নিজেই যাবে। তোমায় তো চিনে গিয়েছে।"

"আমিই যাচ্ছি। ....এখানে ডাক্তারখানা কোথায়?"

"কেন?"

"বাবু ক'টা ওষুধ লিখে দিয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।"

"কী হয়েছে হঠাৎ?" বিলাস উদ্বেগ বোধ করল।

"কিছু হয়নি। মায়ের খুচরোখাচরা অনেক ওষুধ থাকে। একটা বড় কৌটোয় রেখে দেন। সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না। ভুলো মন বড়।"

"ও! ....তুমি থানা মোড়ের দিকে চলে যাবে। দেখবে একটা আমগাছের পেছনে ওষুধের দোকান। ডিসপেনসারি। সাইনবোর্ড আছে। ভিড়ও দেখতে পাবে। ডাক্তারবাবুও থাকেন।"

বদ্যিনাথ চলে গেল।

বিলাস আবার কাজ নিয়ে বসল। হাঁকাহাঁকি, তদারকি। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের ধমক। বেটাদের হাজার বার বলো, নোংরার অভ্যেস আর গেল না। শালা ঝেঁটাটা কোথায় রেখেছে দেখেছ? শালপাতাগুলো ধুলোয় লুটোচ্ছে। জলের কলসির ওপর ঢাকনা নেই।

গালাগাল দিতে দিতে বিলাস হঠাৎ থেমে গেল। কানহাইয়ার কী যেন হয়েছে। কাঁপছে ভীষণ। চোখ লালচে হয়ে এসেছে।

ছোঁড়াটার জ্বর এল নাকি !

বিলাস তাকে ডাকল। দেখল। বলল, "আধা ঘণ্টা শুয়ে থাকবি। তারপর দেখব। তুকার বোখার বড় যাই তো ডাগতারবাবু কো উঁহা চল্ যাবি।"

কানহাইয়া সামনে থেকে চলে গেল।

নয়

প্রায় একটা সপ্তাহ বিলাস আর 'উষাবীথি' যেতে পারল না। সকালে তাড়া থাকে। শীত পড়েছে হাড়-কাঁপানো, সকালে উঠতে না উঠতেই সাতটা বেজে যায়। শিবানীর আবার ঠাণ্ডা লাগার ধাত, ভোরে কুয়ার জল ঘাঁটাঘাঁটি সহ্য হয় না। একটু বেলা করেই দিনের শুরু বলে বিলাসের তৈরি হয়ে হোটেলে বেরুতে বেরুতে সওয়া আট সাড়ে আট।

হোটেলে এ সময় খানিকটা চাপও থাকে। চেঞ্জার বাড়ছে। সকাল বিকেল বিক্রিবাটাও বেড়েছে খানিক। যারা হাত-পা ঝাড়া হয়ে এসেছে দু'চার দিনের জন্যে বেড়াতে — তারা বিলাসের হোটেলেই দুবেলা খেয়ে নেয়, বা খাবার নিয়ে যায়। আবার ছোকরারা ঠাট্টা করে বলে 'হোটেল বিলাস'। ভিণ্ডি ভেঁড়া খাইয়ে দিব্যি চালাচ্ছে। বিলাস শোনে, কিছু বলে না। কলকাতার দিকের ছোকরা সব। কথার রপ্ত আছে। তবে, বেয়াড়া কথাবার্তা বলে না। বিকেলেও যাওয়া হয় না উষাবীথি। খদ্দের সামলানো ছাড়াও বিকেলে অন্য অসুবিধে ছিল যে, সন্ধের পর — হোটেল সামলে যাওয়া-আসা কষ্টকর! শীতটা যে জব্বর পড়েছে। তার ওপর নিরাপদদের পাল্লায় পড়ে একদিন বড়দিন করা হল। বেহেড অবস্থা তখন।

উষাবীথির খোঁজখবর অবশ্য রোজই পাচ্ছিল বিলাস। বদ্যিনাথ না নয় মালী আসত বাজারে, সকালবেলায়। হোটেলে এসে খবর দিয়ে যেত।

প্রায় সাত দিনের মাথায় বিলাস শেষ বিকেলে আধো অন্ধকারে হাজির হয়ে গেল 'উষাবীথি'তে। সাইকেল নিয়েই এসেছে। সঙ্গে বড় টর্চ। টর্চটা কায়দা করে হ্যান্ডেলের সামনে রাখার ব্যবস্থা আছে তার। গায়ে গলাবন্ধ কোট, ওবার কোট ধরনের। মাফলার আর টুপিও নিয়েছে। ফেরার সময় হাড় কাঁপাবে পৌষের হাওয়া।

"এই যে বিলাস, এসো।"

"ক'দিন আসতে পারিনি আর," বিলাস বলল, যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে, "হোটেলের কাজে আটকে গিয়েছিলাম।"

"তাতে কী: বদুর মুখে খবর তো দিয়েছিলে।"

"আপনারা কেমন আছেন?"

"খারাপ নয়। ভালই। আমি চাঙ্গা হয়ে উঠছি," গিরিজাশঙ্কর বললেন, "বেশ লাগছে। তোমাদের মাসিমাই বিকেল থেকে জবুথবু হয়ে পড়ে।"

"ঠাণ্ডায়।"

"ওর একটা স্প্যাসম মতন হয় বেশি ঠাণ্ডায়। তবে বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি এখনও। সকাল দুপুর রোদ ছেড়ে ওঠে না। ভাল আছে।"

"উনি সাবধান থাকেন!"

"তা থাকে। চলো ভেতরে গিয়ে বসি।"

বসার ঘরে এসে বসল বিলাস। গিরিজাশঙ্কর আলো দিতে বললেন।

আলো এল।

"তোমাদের এখানে সবই ভাল, শুধু মশার উৎপাতটা বেশ।"

"আজ্ঞে। আমি আগেই বলেছিলাম।"

"আমরাও ওদিকে আরামে থাকি না। কলকাতা তো মশার ডিপো হয়ে গিয়েছে, আমরা হলাম মফস্বলের — আমাদের অবস্থা বুঝতেই পার।"

"কাগজে দেখি।"

"কাগজ কতটুকু দিতে পারে। ...ভাল কথা, এখানে কাগজ পাওয়াটা প্রবলেম।"

"পান না? আমি যে বলে দিয়েছিলাম।"

"রোজ পাই না। আসেও বিকেল গড়িয়ে। ফলে বাসী কাগজ আরও বাসী হয়ে যায়। তাতে অবশ্য মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরাবরের অভ্যেস বলে একটু মন খুঁতখুঁত করে। ...তা বলে ভেব না আমি কাগজের পোকা!"

বিলাস হাসল। "মাসিমা এমনিতে —"

"না। এমনিতে ঠিক আছে ....বউমা কেমন আছে?"

"ঠিকই আছে। ও একটু শীতকাতুরে।"

"বলো কী! এখানে এতকাল রয়েছে, তবু—!"

বিলাস কিছু বলল না।

দু'দশটা অন্য কথা। জলের গুণ, শাক-সব্জির স্বাদ, দুধ...। তারপর গিরিজাশঙ্কর নিজেই বললেন, "সকালে রোদ উঠে গেলে আমি রাস্তা ধরে হাঁটি খানিকটা। ওই তোমার 'দয়াময়ী কুটির' পর্যন্ত। এ পাশে চার পাঁচটা মাত্র বাড়ি।"

"লোকও কম। তিনটে বোধহয় ফাঁকা। শুনলাম সারখেলবাবুরা আসবেন এবার।"

"কোন বাড়ি ?"

"ওই হলুদ রঙের —"

"বুঝেছি। ....সাধনের চিঠি পেয়েছ?"

"না।"

"আমি লিখে দিয়েছি সব। চিঠি পাবে।"

"সাধনদার সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি আছে।"

গিরিজশঙ্কর কাশলেন বার দুই। শীতের শুকনো কাশি। হঠাৎ বললেন, "এক

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল রাস্তায়। "মধু নিবাস" -- ওই যে —"

"শশাঙ্কবাবু।"

"হ্যাঁ।"

"এখানেই থাকেন উনি। দুই ভাই। শশাঙ্কবাবু একসময় নেপালে ছিলেন। ওখানে পড়াতেন।"

"শুনলাম। কথা কম বলেন। ভদ্রলোক ফুল নিয়েই সময় কাটান। বললেন, গোলাপ দেখাবেন বাগানের।"

"ওঁর হাত ভাল। ফুল যেন ওঁর হাতে কথা বলে।"

"আমার ঠিক উলটো। আমার কতবার শখ হয়েছে ফুল ফোটাব। চেষ্টাও করেছি। টব, মাটি, সার, নার্সারির গাছ, বিচি — কিছুতেই হয় না। ফুল যা ফোটে — তাও শুঁটকে মতন। হাতের দোষ।" গিরিজা হাসলেন।

বিলাসও হাসল।

চা এল একসময়।

"তোমার হোটেলে এই সময়টায় বেশি ভিড় হয়, তাই না?"

"হ্যাঁ। সিজন কেটে গেলে সাধারণ ভিড়। রোজই যেমন হবার হয়।"

"তা হোক। তোমার তো কোটিপতি হবার দরকার নেই—"

"কোটিপতি।" বিলাস হাসল।

"ওই বললাম। কোটি না হোক লাখ কয়েকের মালিক। তোমার দরকার কিসের। বেশ আছ।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "মানুষের মুখ আছে পেট আছে সে খাবে এ তো ঠিক কথাই। কিন্তু বিলাস, টাকা যখন মানুষকে খায় সে কী না হয়! টাকা, লোভ, দম্ভ, প্রতিষ্ঠা, লালসাও মানুষকে খেয়ে ফেলে। তখন সে আর মানুষ থাকে না।"

বিলাস চায়ের কাপ নামাল। এখনও বেশ গরম। টাটকা লুচির গন্ধ উঠছিল প্লেট থেকে।

ঘর গাঢ় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল কখন, ফলে কেরোসিন টেবল্ ল্যাম্পের মেটে আলো হলুদ হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে সামনেটুকু, দেওয়াল ছুঁয়ে কোথাও অন্ধকার, কোথাও ফিকে আলোর রেশ, মশা উড়ছে চেয়ারের আশেপাশে, স্কাইলাটের দুটি গর্ত দিয়ে যেন বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে। অবশ্য দুটি গর্তই আপাতত কাচে আড়াল করা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেমন স্তব্ধ ভাব যেন।

শেষে বিলাস বলল, যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, বলল, "আপনাকে বলা হয়নি। আমি আরও খোঁজ করেছিলাম। চাঁদবাবুর কাছেও গিয়েছিলাম। ওঁরা সবচেয়ে পুরনো

লোক এখানকার। চাঁদবাবুর বয়েস আশির ওপর। উনিও গুহার কথা বলতে পারলেন না।"

গিরিজাশঙ্কর তাকিয়ে থাকলেন।

বিলাস চাঁদবাবুর অনুমানের কথাও বলল। বিস্তৃত ভাবেই। রেললাইন পাতার সময় পাহাড়ি পাথরের ঢিবি ফাটানো হয়েছিল, তখন যদি কোনও গুহা থেকে থাকে, ডিনামাইটের দাপটে উড়ে গিয়েছে।

"চাঁদবাবু যখন বলতে পারলেন না —" বিলাস বলল, "অন্য কেউ বলতে পারবে না। গুহা নেই।"

"নেই?"

"থাকলে কেউ জানত না?"

"কিন্তু আমি যে পড়েছি।"

"কোথায়?"

"সে অনেক কথা। ...ছোট করে বলি। আমি যখন দিল্লিতে থাকতাম, দরিয়াগঞ্জে, আমার বাড়ির মাথার ওপর এক ভদ্রলোক থাকতেন, তিনি দিল্লি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির চার্জে ছিলেন। পণ্ডিত মানুষ। তাঁর বাড়িতে ওঁর বসার ঘরে অনেক বইপত্র ছিল। নিজের। আমার সঙ্গে ভাব ছিল। দুজনে ওঁর বসার ঘরে বসে চা খেতাম, গল্পগুজব করতাম। উনি নানা বিষয়ে কথা বলতেন। একদিন 'কেইভ্' মানে ওই পুরনো গুহাটুহা নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন. আমি শুনছিলাম।" গিরিজাশঙ্কর সামান্য থেমে নিজের চায়ের পেয়ালা তুলে কয়েক চুমুক চা খেলেন।

বিলাসও চায়ের কাপ তুলে নিল।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, "আমাদের দেশে সব দেশের মতনই পাহাড়পর্বত গুহা আছে। বড় বড় বিখ্যাত গুহাও আছে — ইতিহাস যাদের মাথায় করে রেখেছে। এরা অতি প্রাচীন। গুহাচিত্র যাকে বলে কেইভ আর্ট তাও আছে। সেখানে নানা ধর্মের ওঠাপড়ার সময়কার একটা খোঁজও পাওয়া যায়। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন — যাদের যখন প্রতিপত্তি গিয়েছে, তারা নিজেদের শিল্পকে ধরে রাখার চেষ্টাও করেছে, কেইভ আর্টে। ...তা এসব হ'ল পণ্ডিতি ইতিহাস। যাঁদের উৎসাহ আছে— এই নিয়ে কত মাথা ঘামান।"

বিলাস শুনছিল। কিছুই বুঝছিল না। কোন এক প্রান্তে পড়ে থাকা — ছোট্ট এক মফস্বলি আধা-শহরের মানুষ সে, ডালভাতের হোটেল চালায়— তার মাথায় অত শত ইতিহাস, শিল্প, বৌদ্ধ জৈনর কথাবার্তা ঢুকবে কেন! শুনতে হয়, শুনছিল সে।

"তা এই বড় বড় গুহার কথা বাদ দিলেও," গিরিজাশঙ্কর বললেন, "বাদ দিলেও

— ছোট ছোট নগণ্য অনেক গুহা আছে, এখানে সেখানে — যার কথা ইতিহাস বলে না। লোকাল লোকের মুখে তার কাহিনী শোনা যায়। একজন সাহেব এদেশে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। পাহাড়পর্বতের ছবি স্কেচ করার শখ ছিল তাঁর। তিনি একটা বই লিখেছিলেন পরে। বিলেতে ছাপা হয়েছিল। সেই বইয়ে এখানকার একটা গুহার কথা লেখা আছে।''

''এখানকার?''

''আমার তো তাই মনে হচ্ছে। ভুল হলেও হতে পারে, বুড়ো মানুষ, অনেক জিনিস ভুলে যাই। তবে এদিকেই হবে। একসময় এই অঞ্চলটাকে নানানডা হিল রেঞ্জ বলা হত। দুশো আড়াই শো বছর আগে।''

''আড়াই শো—।''

''এখানকার একটা গুহার কথা আছে তাঁর লেখায়। তিনি লিখেছেন। স্বচক্ষে গুহাটা দেখেছেনও, তবে তাকে দেখেননি, তার কথা শুনেছেন।''

''কার কথা!''

''এক সাধুর। তপস্বী।''

''সাধু! ও ...।''

''ও নয় বিলাস, শুধু ও বলে ফেলে দেওয়া যাবে না। সেই সাধুর গল্পও আছে। অদ্ভুত গল্প।''

বিলাস তাকিয়ে থাকল। চা শেষ হয়েছে তার।

গিরিজাশঙ্কর বললেন, ''সাধুরা চান সিদ্ধি। কী সিদ্ধি তা আমি জানি না। হয়ত নিজের মন আত্মা অস্তিত্বেরই এমন এক অনুভূতি যাতে ইহজ্ঞান দৃঢ় হয়। পাখির ডিম ভেঙে ছানা হয়, তখন সে এক রকম দেখতে, পাখির মা খুঁদকুটো ঠুকরোনো ফলের ছিটেফোঁটা এনে বাচ্চাকে খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হয়, তার ডানা ঝাপটায়, পায়ে জোর আসে, উড়তে শেখে — তারপর একদিন সে অসীম আকাশের তলায় উড়ে বেড়ায়। সিদ্ধি বোধ হয় সেইরকম, সাধনা থেকে শুরু, শেষ ওই নিজের বিস্তার।''

বিলাস বলল, ''এমন সাধু সন্ন্যাসী ক'জন?''

''জানি না। আছে এমন, আবার ফাঁকিও অনেক। ....তবে গল্পটা যাঁকে নিয়ে সেই সাধু নাকি সদ্য যৌবনে সাধনার জন্যে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। একসময় ওই গুহায় এসে আশ্রয় নেন। বছরের পর বছর কেটে যায়, সাধুর সাধনা শেষ হয় না। তাঁর জীবনের শেষবেলায় এসে দেখা যায় — তিনি আর মানুষ নেই। পশুর মতন হয়ে গেছেন।''

''পশু! জন্তু —!'' অবাক হয়ে বিলাস বলল।

''না, পশু মানে একেবারে পশু নয়, তবে সেই রকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন।

গায়ের রোম হয়ে গিয়েছে লোমের মতন, মাথার চুল জটা পড়ে পড়ে মুখ কাঁধ ঢেকে গিয়েছে, মুখ হয়েছে অদ্ভুত, বিরাট চোখ, বিশ্রী ধারলো দাঁত, মুখ দেখাই যায় না, হাত পায়ের নখ হয়েছে জন্তুর মতন। তাঁর গলার স্বর আর মানুষের নেই। ভাঙা অস্পষ্ট জড়ানো রুক্ষ হয়ে গিয়েছে স্বর। বোঝা যায় না উনি মানুষ না পশু।''

বিলাস কেমন বিমূঢ়! অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল গিরিজার দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। ''তাই কি হয়?''

''হওয়া উচিত নয়। জন্তু থেকে মানুষ হবার জন্যেই না তার চেষ্টা। তবে, কী জানি বিলাস, আমিও বুঝতে পারি না, আমাদের কি ওই সাধুর দশা হ'ল! মানুষ থেকে পশু হয়ে গেলাম।''

বিলাস এতক্ষণ পরে যেন কেমন এক ছমছমে ভাব অনুভব করছিল। তার খারাপ লাগছিল। দুঃখও হচ্ছিল হয়ত।

অনেকক্ষণ পরে বিলাস বলল, ''আপনি কি সেই জন্যে গুহাটা খুঁজছেন? দেখতে চাইছেন?

''তা বলতে পার! একবার দেখতে পারলে ভাল হ'ত। এখনও তো বিশ্বাস করতে পারি না।''

বিলাস বলল, ''এমন গুহা এখানে নেই। অন্য কোথাও থাকতে পারে।''

গিরিজাশঙ্কর যেন ম্লান ও বিষণ্ণভাবে হাসলেন সামান্য।

দশ

পৌষও শেষ হয়ে এল।

শালজঙ্গলের উত্তুরে বাতাস এখন বড় তীক্ষ্ণ, শরীর কনকন করে, হাড়ে লাগে সেই তীক্ষ্ণতা। সকালের আকাশ কত পরিষ্কার, রোদও অফুরন্ত, তবু জড়সড় ভাব যেতে যায় না যেন। ধুলো উড়ছে শীতের। চুপচাপ পাতা ঝরে আসছে গাছের, খেতখামারে নতুন গন্ধ, পুকুরের জলে সর পড়ছে বুঝি, সারা রাতের হিম বোধ হয়। মাঠেঘাটের ঘাস শুকিয়ে এল। কাঁঠাল গাছের তলায় হেটো গোরু, গায়ে বস্তা চাপানো, কাছাকাছি কাঠকুটো শুকনো পাতার আগুন। আগুন। বিকেল কী আসে, না, রোদ মরতে এক ছুটে পালায়। অন্ধকার। আকাশ ভরা তারা। কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে আসে। চাঁদের আলোও ময়লা —যেন হিমকুয়াশায় জড়িয়ে আছে।

সেদিন শিবানী বলল, "কই, তুমি মাসিমাদের আনার ব্যবস্থা করলে না?"

"করব। ওঁরা তো আছেন।"

"মনে হয় না।"

"কেন?"

"মাসিমার কষ্ট হচ্ছে।" শিবানী বলল!

বিলাস অবশ্য জানে না। সে 'উষাবীথি'তে দু-চারদিন অন্তর একবার খোঁজখবর করতে যায়। বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সকালে সময়ের অভাব, রাত্রে ঠাণ্ডা। মাসিমাকে দেখতে পায় না — এমন নয়। বড় শান্ত মানুষ। শাল গায়ে দিয়ে বসে থাকেন নরম গদিতে। রোদে। মাথায় শালের আড়াল কখনো, কখনো আড়াল নেই। বসে বসে টুকটাক কিছু করছেন, না হয় তাকিয়ে আছেন সামনে। বাগানে এখন প্রজাপতির মেলা যেন, মরসুমি ফুল ফুটে থাকে বাগানে, গভীর নীল রঙের একটা বুনো ঝোপ ফোয়ারা ছুটিয়েছে রঙের।

মাসিমার সঙ্গে কথাও হয় বিলাসের। অল্প কথা। ওঁর হাসি মুখ, নিচু গলা, মাঝে মাঝেই চোখের কোল মুছে নেওয়া বড় ভাল লাগে বিলাসের। চোখ দুটি দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ওঁর।

গিরিজাশঙ্করকে দেখে মনে হয়, উনি ভালই আছেন। অন্তত ফিরে যাবার কথা কিছু বলেননি।

বিলাস বলল, "তোমায় বলেছেন?"

শিবানী আধা-আধি মাথা নাড়ল। হ্যাঁ-না বোঝা যায় না। তবে সে নিজেই একদিন বাড়ির মেয়েটিকে নিয়ে দুপুর বেলায় ও-বাড়ি গিয়েছিল। মেঠো পথেই। বিকেল শেষ হচ্ছে, অন্ধকার হ'ব হ'ব, ফিরে এসেছে। বেশিক্ষণ বসা হয়নি। কথায় কথায় তার মনে হয়েছে, জায়গাটা মাসিমার ভাল লাগলেও এই ঠাণ্ডা তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মাঘমাসে তো আরও ঠাণ্ডা পড়বে। ওখানে মাঘের দাপটই বেশি। তার ওপর মাঘে একবার বৃষ্টিও হয়। পৌষে হয়নি যখন, মাঘে হবে, শীতের বৃষ্টি।

শিবানী বলল, "তোমার তুলসীকে বলেছ? তার গাড়ি...."

"বলে রেখেছি। তুলসী এখন মেলায় ভাড়া খাটছে। আজ এখানে মেলা, কাল সেখানে। রামলীলা হচ্ছে হরিয়াপুরে। লীলা দেখাতেও লোক নিয়ে যায়।"

"তাহলে?"

"হয়ে যাবে।"

"কবে আর! একদিন একটু বেলায় নিয়ে এসো। এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে জিরোবেন, তারপর বিকেল নাগাদ পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"আচ্ছা! দেখছি।"

বিলাস একটু ব্যস্ত। উটকো এক ঝামেলায় পড়েছে 'মাতৃমন্দির' নিয়ে। বাড়িটা তিন-চার বছর ধরে বন্ধ। বাড়ির মালিক মারা গিয়েছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী নিজেই অসুস্থ। থাকেন বাঁকুড়োয়। বাড়িটা বিক্রি করতে চান। কার সঙ্গে যেন চিঠি লেখালেখি করেছিলেন। সেই ভদ্রলোক — বিহারি — এখন এসে জ্বালাচ্ছে বিলাসকে। বলে, বাড়ির দরদাম ঠিক করে দিতে।

পরের বাড়ি, বিলাস কোন দুঃখে দরদাম ঠিক করে দেবে! সে নিজেই জানে নাকি !

নিরাপদ বলে, "দাও না, তোমার কী। কমিশন টেনে নিয়ো।"

"কী বলছ!"

"কমিশন হল ফেয়ার মানি। কে না নেয়! কাগজ দেখো না!"

বিলাস ভদ্রলোককে বলে দিয়েছে, আপনি নিজে যান — কথা বলুন। আমি দরদামের কথা বলতে পারব না। জানি না।

তবু ভদ্রলোক প্রায়ই জ্বালিয়ে যাচ্ছেন।

সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ার সময় বিলাস বলল, "দেখি, আজ যদি ধরতে পারি। কথা বলব।"

না চাইতেই জল।

রেল ফটকের সামনে তুলসীরাম তার ট্রেকার নিয়ে দাঁড়িয়ে। টায়ার ফেঁসেছে। চাকা পালটাচ্ছিল।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল বিলাস। "কী খবর রে, তুলসী। চাকা ফেঁসেছে।"

তুলসী বলল, তার গাড়ির দুটো টায়ার একেবারে রদ্দি হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই জ্বালায়। তালি মেরে মেরে কতদিন আর চালাবে!

"মেলায় খাটছিস, কামাই হচ্ছে, নতুন কিনে নে।"

"একঠো কিনে লেব. নয়া নয়. সিকিন্ড হ্যান্ড। ....এ দাদা, কুছ টাকা উধার হো

যায়ি তো...."

বিলাস বুঝতে পারল, কিছু টাকা ধার পেলে তুলসীরাম আরও একটা নতুন বা আধা-নতুন টায়ার কিনতে পারে।

"মেলার কামাই কী করছিস?"

"আরেব্বাস! কামাই হামি একলা খাই! চার ছো মুখমে রোটি দিতে হয়, দাদা।"

তা অবশ্য ঠিক। তুলসীরামকে ভাল করেই চেনে বিলাস। অনেক বছর ধরে। তুলসী যখন বাচ্চা, বাস কোম্পানীতে মাল তুলত, পরে বাস-খালাসি তখন থেকেই। লোকটা ভাল। গাড়ি বসে আছে, ভাড়া নেই, তুলসী মাঝে মাঝে বিলাসের হোটেলে এসে চা খায়, গল্প করে, পেট্রম্যাক্স ঠিক করে দেয়।

"কত টাকা?"

তুলসী টাকার একটা হিসেব বলল।

"দেখি! ....তুই আমার একটা কাজ কর।"

"জরুর।"

বিলাস বলল, একদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ট্রেকারটা তার চাই। একনাগাড়ে না হোক সকালে ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা, বিকেল নাগাদ ঘণ্টা তিনেক। ওই যে বুড়োবাবু আর বুড়িমাই এসেছে ওঁদের নিয়ে আসতে হবে বিলাসের বাড়িতে, আবার বিকেলে পৌঁছে দিতে হবে উষাবীথি।

তুলসী বলল, মেলা খতম। এদিকে আর মেলা নেই। কাল পরশুর বাদ তার গাড়ি ডিপোর কাছেই পড়ে থাকবে! যখন বলবে দাদা সে হাজির হয়ে যাবে।

বিলাস বলল, ঠিক আছে, কালই জানাবে সে তুলসীকে।

গিরিজাবাবুদের সঙ্গে কথা না বলে দিন ঠিক করা যায় না। আজই হোটেল থেকে ফেরার পথে একবার ও-বাড়ি হয়ে ফিরবে। যা ঠাণ্ডা চলেছে — সন্ধের দিকে আর যাওয়া চলে না।

মাঝে তিনটে দিন। তারপরই এক সকালে — খানিকটা বেলায় — বুড়োবুড়িকে নিয়ে হাজির হ'ল বিলাস নিজের বাড়িতে। বদ্যিনাথ আর কাননকেও আনতে চেয়েছিল। বাড়ি ফেলে ওরা এল না। পরে একদিন আসবে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বউদির কাছে।

শিবানী তৈরি।

তাদের বাড়িতে অতিথি বলতে নিরাপদ, ভৌমিক, দক্ষিণাবাবুরাই বছরে এক-আধদিন খাওয়া-দাওয়া করতে আসে। বিজয়ার পর তো অবশ্যই। আর আসে কিরীট। তবে সে তো সেভাবে অতিথি নয়, মাঝেমাঝেই চলে আসে শিবানীর সঙ্গে গল্পগুজব

করতে।

সাধনবাবুদের একবার এনেছিল বিলাস। অত বড়লোক মানুষ, কলকাতার বরানগরের বনেদি লোক, তবু কোনো দেমাক নেই, নাক সিটকোনো ভাব নেই। দিব্যি খেলেন দেলেন, গল্পগুজব করলেন। শিবানীকে ডাকলেন বউমা বলে। বেশ লেগেছিল শিবানীর।

এবার এলেন মেসোমশাই মাসিমা।

স্নান সেরেই এসেছেন। ওঁদের পৌঁছে দিয়ে তুলসীরাম তার ট্রেকার নিয়ে চলে গেল। দুপুরের শেষদিকে আবার আসবে।

মাসিমার জন্যে শিবানীর সব ব্যবস্থা করা ছিল। রোদে বসবেন বলে পিঠ-হেলানো বেড়ের মোড়ায় পুরনো গদি পাট করে রেখেছিল বারান্দার শেষ প্রান্তে। ওদিকটায় সারা বেলা রোদ থাকে। মাসিমা জল খান উষ্ণ। তাঁর জল রেখেছিল আলাদা। উনি ভাজা মশলা বা মউরি মুখে দেন একটু আধটু। মউরিও রেখেছিল।

গিরিজাশঙ্করের অত কিছু লাগে না। কিছুদিন আগে তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল যে — তাও এখন বোঝা যায় না, তেমন। বরং এখানে এসে তাঁর উন্নতি হয়েছে শরীর স্বাস্থ্যের। মাসিমারই হয়নি।

গিরিজাশঙ্কর বিলাসকে নিয়ে কেশবপল্লীতে ঘুরলেন খানিকটা। বাড়িগুলো বাহারি নয়, দু-একটি বাদে, তাও বা মামুলি বাহার। অর্ধেক বাড়ি খালি পড়ে আছে। জীর্ণও হয়ে গিয়েছে বেশ। মালিকরা খোঁজ নেয় না। হয়ত একদিন বেচে দেবে।

এখানে উঁচুনিচু মাঠ একদিকে, অন্যদিকে বালিয়াড়ি। পাশে রেললাইন। গাড়ি যাচ্ছে আসছে। মালগাড়িই বেশি। ট্রেনের শব্দ, এঞ্জিনের হুইসেল, হঠাৎ হঠাৎ কাক-পাখির দল বেঁধে ডাকাডাকি। আকাশে চিল উড়ছে রোদ মেখে। নীল দিগন্তে বনের সবুজ। আলোরোদ সবুজকে আরও যেন গাঢ় করেছে।

গিরিজাশঙ্করের ভাল লাগছিল। গল্প করছিলেন। গাছপালা সব চেনেন না। আম-জাম-নিম আর কে না জানে! কতরকম বুনো গাছের ঝোপ বালিয়াড়িতে। আবার জংলি ফুল, লাল বেগুনি হলুদ।

তোমার হাজরাবাবার গল্প বলো শুনি।

গল্প শুনতে শুনতে অলস হয়ে শুয়ে থাকেন ডেক চেয়ারে। তারপর হঠাৎ বলেন, সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, বিলাস। এককালে খুবই খেতাম। লাং-ট্রাবল হচ্ছিল কমিয়ে দিলাম। তারপর হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার বলল, একদম না। ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিতে আমি পারি। কী না ছেড়েছি, বলো! কিংবা কে না আমাকে ছেড়ে গিয়েছে। শুধু একজনকে ছাড়তে পারি না। ওই বুড়িকে। আঠার মতন জড়িয়ে আছে। বলেই হাসি।

জোরে নয়, আবার ধীরেও নয়।

বিলাস লজ্জাসঙ্কোচ ভুলে সিগারেটের প্যাকেট এনে দিল।

গিরিজাশঙ্কর একটাই খেলেন। তাও অর্ধেক।

খাওয়াদাওয়ায় দুজনেই সমান। অল্প খান। আমিষ বলতে মাছ যৎসামান্য। মাংস ওঁরা খান না। ডিমও নয়। সব্‌জি খেতে পছন্দ করেন। এটা কী বউমা? পায়েস? পায়েস খাব আবার! পেট ভারী হবে।

বিশ্রাম সারা হল।

দুপুর ঢলে আসছে, তুলসীরাম এসে হাজির।

আগে থেকেই কথা ছিল, বিকেল ফুরোবার আগেই বিলাস ওঁদের নিয়ে নদী আর জঙ্গলের দিকটা দেখিয়ে আনবে।

গিরিজাশঙ্কর উঠে পড়লেন।

শিবানীও তৈরি হল মাসিমাকে নিয়ে।

চারজনে ট্রেকারে এসে বসল যখন তখন দুপুরের রোদ আলো পড়ন্ত। তাত নেই আর রোদের। নতুন মাঘের হাওয়া দিয়েছে শন শন।

নদী আর জঙ্গল কাছে নয়। মাইল দুই আড়াই। তবে রাস্তা আছে। কাঁচা রাস্তা। পাথর আর মাটি মেশানো। গর্ত অঢেল, বয়েল গাড়ির চাকায় চাকায় আরও খোঁদল হয়েছে অনেক জায়গায়।

"নদীর নাম কী, বিলাস?"

"ও-পাশের ছোট নদীটার দেহাতি নাম ছুলকি। ওটা পাহাড়ি নদী। ঝরনা বয়ে এসেছে বোধহয়। শীতে একটা নালা, পাথর অজস্র। ওটা গিয়ে মিশেছে বরাকর নদীতে। আমরা বরাকর নদীতেই যাচ্ছি।

"তোমার হাজরাবাবার সেই আমলকী বন, যেখানে তিনি তাঁর দাহকর্মের জায়গা বেছে রেখেছিলেন।"

"সেটা ওপাশে, ছুলকি নদীর দিকে।"

পেছনের সিটে বসে শিবানী তার মাসিমাকে নিচু গলায় কত কী শোনাচ্ছিল। তুলসীরাম ট্রেকার চালাচ্ছিল সাবধানে। গর্ত বাঁচিয়ে, গাড়িতে যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে। তার গাড়ির চাকাও তো ভাল নয়। একজোড়া টায়ার একেবারে রদ্দি।

এই রাস্তার দু-পাশেই গাছ। আবার গাছ ফুরোলেই মাঠ, একেবারে খটখটে মাঠ, বড়জোর কিছু ঝোপ। গাছের বেশিরভাগই নিম আর দেবদারু। কখনো সখনো চোখে পড়ে মস্ত বটগাছ। মরা দুপুরে মাঠও মরে আসছে যেন। রোদ ফিকে হয়ে এসেছে। এক একবার মাঠের ওপর দিয়ে ঘুর্ণির মতন দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। শুকনো পাতা,

ধুলো উড়ছে মাঠে।

শেষ পর্যন্ত নদী।

নদীর খানিকটা আগেই ট্রেকার থেমে গেল। আর যাওয়া যাবে না।

বিলাস বলল, "ওই যে নদী। আর জঙ্গল।"

দেখলেন গিরিজাশঙ্কর। নামলেন।

শিবানী বলল, "মাসিমা পারবেন না। আমরা বরং এখানেই বসি।"

"গাড়ি থেকে নামবে না?"

"মাসিমা বার বার ওঠা-নামা করতে পারবেন না। কষ্ট হবে।"

"তবে বসো। আমরা একটু ঘুরে আসি।"

গিরিজাশঙ্কর ছড়িতে ভর দিয়ে ঢালু পথে নামতে লাগলেন।

বিলাস বলল, "পাথর সামলে নামবেন।"

এগারো

বিলাসরা বাড়ি ফিরেছে খানিকটা আগে।

গরম জল করে রেখেছিল গঙ্গা। বড় কাজের মেয়ে। বিলাসের গরম জল লাগে না, লাগে শিবানীর। কাপড়জামা বদলে মুখ-হাত ধুয়ে চা খাওয়া হল। জিব পুড়ে যাবার মতন গরম। কিন্তু আরামের। শীতটাও আজ বেশি, হাড়মাংস কনকনিয়ে দেয়। সন্ধেও হয়ে গিয়েছে।

চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বিলাস যেন ধাতে এল। তারপর লেপ টেনে নিয়ে বিছানায়।

শিবানী বলল, "যাই রুটি কটা করে নিই। উনুন জ্বলছে। গঙ্গা আটা মেখে রেখেছে," বলে গায়ে মাথায় গরম চাদর জড়িয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

বিলাস শুয়ে থাকল। ঘরে ল্যাম্প জ্বলছে। আলো এবং অন্ধকার—কমবেশি যেমন ছড়িয়ে থাকে ছড়িয়ে আছে। জানলা বন্ধ। এখন আর জানলা খোলা যায় না— এত ঠাণ্ডা আর বাতাস শীতের। দরজা খোলা।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল বিলাস। দিনটা আজ ভালই গেল। তাদের কোনো আত্মীয় নেই, মেলামেশা করে দু-একটা দিন থাকাও হয় না। বিলাস হোটেল নিয়ে থাকে — সঙ্গী বন্ধুবান্ধব আছে—তার একঘেয়েমি লাগার কথা নয় তেমন। শিবানীরই সঙ্গী নেই। বাড়িতে গঙ্গা; আর বাইরে কাছাকাছি বাড়িতে যমুনাপিসি কিংবা মনিবউদি।

আজ সারাটা দিন চমৎকারই কেটে গেল, হালকা, কেমন এক তৃপ্তির স্বাদ, মেলামেশার গাঢ়তা নিয়ে।

সবই ঠিক। তবে একটা ব্যাপারে মন খুঁতখুঁত করছিল বিলাসের।

ওরা দু'জন যখন নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর বসে ছিল, পাড় ঘেঁষে মাটি, ভাঙাচোরা ছড়ানো পাথর, ঝুঁকে পড়া গাছ, জঙ্গল, ঝোপ—ওদিকে সূর্য একেবারে ডুবে যাচ্ছে, আকাশ তখনও কালো নয়, কোথাও ধূসর, কোথাও শেষ আলোর রেখা পড়েছে মেঘের কোণে—তখন গিরিজাশঙ্কর দূরে তাকিয়ে থাকতে বললেন, "ওটা ব্রিজ না?"

বিলাস তাকাল। দেখল। অনেক দূরে — যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে, অস্পষ্টভাবে সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে। বড়সড় বা মাঝারি ব্রিজও এটা নয়। ছোট ব্রিজ। সাঁকোই বলা যায়। ছুলকি নদী এসে মিশেছে ওখানেই। রেল ব্রিজ। ধুসর আলো, নদীর ওপর একটা ধোঁয়াটে ভাব, যেন কুয়াশা নামার শুরু এবার, গাছে জঙ্গলে কালো জড়িয়ে গেল, পাখিরা ফিরে যাচ্ছে, আকাশ বড় বিষণ্ণ, মাঘের অপরাহ্ন বেলা শেষ হয়ে এল — তখন সাঁকোটা ছায়ার মতন দেখায়। গিরিজাশঙ্কর ঠিকই অনুমান করেছেন। তিনি

দূরের জিনিস দেখতে পান। অবশ্য চশমাও চোখে ছিল।

বিলাস বলল, "হ্যাঁ"।

"ওখানেই পাহাড় ছিল?"

"পাহাড় নয় ঠিক; পাথরের চাঁই। ছোট ছোট পাহাড়ি ঢেউ। তাই শুনেছি।"

"ওখানেই পাথর ফাটিয়ে রেললাইন পাতা হয়েছে সাঁকো পর্যন্ত।"

"আজ্ঞে, চাঁদবাবু তাই বলেন।"

"কিন্তু গুহা?"

"গুহা!"

"গুহাটাকে উড়িয়ে দিল?"

বিলাস চুপ। সে কেমন করে জানবে। আদপেই কোনো গুহা ছিল কি না কে বলতে পারে!

"থাকলে দেখতে। হয়ত দাগও পড়েছিল।"

"পাথরে দাগ!"

"কেন ধরবে না, বছরের পর বছর যদি কেউ থাকে দাগ ধরবে না। সদ্য যৌবন থেকে জীবনের শেষ—"

বিলাস শুনল। শুনেছে আগেই। সংসার ছেড়ে নির্জনে চলে এসেছিল এক যুবক। সাধুর বেশ পরেছিল। আশ্রয় নিয়েছিল গুহায়। তার কিসের তপস্যা কে জানে। উনি বলেন, সিদ্ধির। কিন্তু মানুষটা ওভাবে থাকতে থাকতে শেষ পর্য্যন্ত পশুর মতন হয়ে গেল কেমন করে! তাই কি হয় নাকি ! চেহারা পালটে যেতে পারে অবশ্যই। পশু তো হতে পারে না।

এসব গল্প। বানানো। কতরকম গল্পই তো থাকে, তার সত্যি কতটা মিথ্যে কতটা কে বলবে! পুরো মিথ্যেও হতে পারে! পারে না।

বিলাস ওসব কথায় যায়নি। গিরিজাবাবু যখন পড়েছেন কোথাও—কোনো বইয়ে, বিশ্বাসও করেছেন—তখন মুখ্যু বিলাস কোন সাহসে বলবে, এমন হয় না। আপনি গল্প পড়েছেন।

কথা না বাড়িয়ে বিলাস বলল, "হয়ত এখানে নয়, অন্য কোথাও কাছাকাছি থাকতে পারে।"

"অন্য কোথাও!...তা হবে।"

শিবানী হিহি করতে করতে ফিরে এল ঘরে। এসেই বিছানায়। কোল করে বসল। লেপ চাপা দিল কোলে। "কী ভাবছ?"

বিলাস খেয়ালে ছিল না, শিবানীর গলা শুনে হুঁশ হল।

"কী ভাবছ?"

"না। ভাবছিলাম উনি এখানে এসে পর্যন্ত গুহাটার কথাটা ভুলতে পারলেন না। আশ্চর্য!"

লেপের তলায় হাতে হাত ঘষতে ঘষতে শিবানী বলল, "ও রকম হয়, বুড়ো মানুষ। মাথায় ঢুকেছে। বাদ দাও।

তখন কত রাত কে জানে! মাঝরাত, না, শেষ রাত ?

বিলাস স্বপ্ন দেখছিল।

স্বপ্ন দেখছিল সে অদ্ভুত এক জায়গায়, পাথর, পাহাড়, গাছ, জঙ্গল---সব কালোয় কালো—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে এক গুহা।

গুহার মুখের সামনে অদ্ভুত এক পশু। বিরাট মুখ, মুখের চারপাশে লোম, গর্তে ঢোকা বড় বড় লাল চোখ, ভোঁতা নাক, বিশ্রী দাঁত। পশুটার সারা গায়ে ভালুকের মতন লোম। কী ভয়ংকর নখগুলো।

বনমানুষ নাকি !

ভয় পেয়ে গিয়েছিল বিলাস।

পশুটা নড়ে না, চড়ে না। শব্দ করে না। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিলাস কী ভেবে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে মারল তফাত থেকে। কোনো সাড়া নেই। মরা নাকি ? না ওর গায়ে কিছু লাগে না?

হঠাৎ কেমন বিরক্তি রাগ বোধ করে বিলাস পর পর কয়েকটা পাথরের টুকরো ছুড়ে মারল। শেষ টুকরো পাথর নয়, অন্য কিছু। মড়ার খুলির মতন দেখতে। হয়ত তাই।

বিরক্ত হল পশুটা। শব্দ করল।

বিলাসের গলা শুকনো, বয়ে বুক ভারী হয়ে এসেছে, পা কাঁপছিল। তবু বলল, "তুমি কে? মানুষ, না, পশু?"

কোনো শব্দ নেই। যেন বিলাসকে, বিলাসের প্রশ্নটাকে সে উপেক্ষা করল।

"তুমি কথা বলতে পার না?"

পশুটা একইভাবে তাকিয়ে আছে।

"তুমি তবে পশু?"

এবারও সাড়া নেই। গা নাড়িয়ে হাত-পা---কী যে বোঝা যায় না—নিজের ঘাড়ে

রাখল!

"অদ্ভুত পশু তুমি! গলাও নেই তোমার?"

এবার একটা শব্দ হল। ঘড়ঘড়ে শব্দ! কোনো জন্তুজানোয়ার বিরক্ত হলে যেমন শব্দ করে। যদি কথাও হয়ে থাকে— তবু ওই কথা বা শব্দ মানুষের গলা থেকে আসতে পারে না।

বিলাস আচমকা খেপে গেল। আরও একটু দূরে সরে গিয়ে হাতের কাছে যা জুটছিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল।

পশুটা শেষ পর্যন্ত উঠল।

পিছিয়ে এল বিলাস।

না, এগিয়ে এল না পশুটা। পরম নির্বিকার নিস্পৃহ যেন। বিলাসকে উপেক্ষা করে বনমানুষের মতন গুহার মধ্যে চলে গেল।

আর কিছু দেখতে পেল না বিলাস। অন্ধকার। নিবিড়, ঘন জঙ্গলের আঁধারে সব আচ্ছন্ন।

ভয় পেয়ে গেল বিলাস।

"শিবানী! শিবানী!"

শিবানী ধড়ফড় করে উঠে বসল।

'টর্চটা জ্বালো।"

"কী হয়েছে?" শিবানী টর্চ জ্বেলে স্বামীর মুখের দিকে ফেলল। ভীত, সন্ত্রস্ত, পাংশু মুখ। কপালে কি ঘাম! "কী হয়েছে?"

"না। না। স্বপ্ন দেখলাম। সেই গুহা। সেই....

শিবানী বলল, "আবার স্বপ্ন! জল খাবে। এখনও রাত ফুরোয়নি। জল খেয়ে শুয়ে পড়।"

বারো

পরের সপ্তাহেই ফিরতে হ'ল গিরিজাশঙ্করকে। স্ত্রীর শরীর খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। এখানে ভাল ডাক্তারবদ্যি কোথায়!

ফেরার ব্যবস্থা পাকা করল বিলাস। বরানগরের মল্লিকমশাইকে খবর দিল টেলিগ্রামে। রেলের ভৌমিক টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেলল। তুলসীরাম ট্রেকার করে বুড়োবুড়িদের এনে পৌঁছে দিল স্টেশন। সঙ্গে মালপত্র।

সকালের দিকে মেইল ট্রেন। সওয়া ন'টা নাগাদ আসবে এখানে। সন্ধে নাগাদ হাওড়া।

গাড়ি এল সাড়ে ন'টায়।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল সকলে। ওঁরা চারজন, আর এদিকে বিলাস, শিবানী আর নিরাপদ। নিরাপদ রেলের লোক। গার্ডসাহেবকে বলে দু-চার মিনিট বেশি আটকে রাখবে গাড়ি। মালপত্র তোলা, তারপর বুড়োবুড়ি।

লোকজন তো কম নয়। মালপত্র তোলা হয়ে গেল আগে।

রমাকে তুলতে হবে সাবধানে।

শিবানী নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মাসিমাকে। বুড়ি গালে গাল লাগিয়ে আদর করলেন, চিবুকে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেলেন!

বিলাসও প্রণাম করল।

"ভাল থেকো বাবা। ভগবান তোমাদের ভাল রাখুন।"

রমাকে ওঠানো হ'ল।

এবার গিরিজাশঙ্কর। যে-বেশে এসেছিলেন, সেই বেশেই ফিরছেন।

শিবানী প্রণাম সারল। মাথায় হাত রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করলেন গিরিজা।

আগে কখনো বিলাস গিরিজাশঙ্করকে প্রণাম করেনি। আজ করল।

গিরিজাশঙ্কর কাঁধে হাত রাখলেন বিলাসের। "আসি বিলাস! যেমনটি আছ — এইভাবে থাকতে পারলে থেকো।"

উনি পাদানিতে পা রাখতে যাবেন বিলাস বলল, "আবার একবার আসবেন।"

"আবার!" বলে এক মুহূর্ত থেমে কামরার ভেতরটা দেখালেন চোখের ইঙ্গিতে। "কেমন করে আসব! একজনে কি আসা যায়!"

গার্ডসাহেবের হুইসেল বাজল।

শিবানীর দু'চোখে জল। শালের প্রান্ত দিয়ে ঠোঁট নাক আড়াল করে রেখেছে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। এগিয়ে চলেছে, আস্তে, আস্তে। শব্দ হচ্ছে চাকার।

নিরাপদ হঠাৎ বলল, "বড় ভাল ভদ্রলোক!"

বিলাস কিছু বলল না।

শিবানী চোখ মুছছিল। পারছিল না।